অদৃষ্টের পরিহাস

(উপন্যাস)

বেহুলা, বীরপূজা, ময়ূর সিংহাসন, ভক্তকবীর
প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীহরনাথ বসু-প্রণীত

প্রকাশক—

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৭নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯২২

মূল্য ১॥০ টাকা।

অদৃষ্টের পরিহাস

প্রথম খণ্ড

ব্যবসায়িগণ মরিয়াছে—যাহারা আছে তাহারা রোগের তাড়নায়, দারিদ্র্যের পীড়নে একরূপ মৃতপ্রায়। সুখের পল্লী-জীবন আমাদের শেষ হইয়া গিয়াছে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরে মলয়পুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। তথায় প্রায় দুই তিন শত ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস; তদ্ব্যতীত বাগ্দিপাড়া, কুমার পাড়া, তাঁতিপাড়া প্রভৃতি স্থানে লোকসংখ্যা গণনা করা যাইত না। মলয়পুর বস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ—তথায় প্রায় আট শত ঘর তন্তুবায়ের বসতি ছিল। বিলাত-প্রত্যাগত বস্ত্রাদি তখনও দুর্ভাগ্য বঙ্গের বস্ত্র-ব্যবসায়ের স্থান অধিকার করে নাই। যে খদ্দর ও স্বদেশী-বস্ত্রের জন্য আজ সমগ্র ভারতে এই বিরাট্ আন্দোলন—তখন ঘরে ঘরে সেই দ্রব্যের প্রচলন ছিল।

ভবেশচন্দ্র ঘোষাল মলয়পুরের একজন ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি অকৃতদার—দিবারাত্র পূজা তপ জপ লইয়াই থাকিতেন—জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। দেশবিদেশ হইতে লোকে তাঁহার কাছে কোষ্ঠি করাইবার জন্য আসিত। ইচ্ছা করিলে ভবেশচন্দ্র বহু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন,—কিন্তু তিনি নির্লোভ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন—স্বেচ্ছায় যে যাহা তাঁহাকে দিয়া যাইত তাহাই তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বলিতে কি, যত্র আয় তত্র ব্যয়—

গৃহে সদাব্রত—বারমাসে তের পার্ব্বণ। অতিথি-অভ্যাগতকে তিনি পরিতোষের সহিত খাওয়াইতেন। তাঁহার নিজের বেশভূষা ও আহারাদির কোন পারিপাট্য ছিল না। ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছিলেন।

ভবেশচন্দ্রের কনিষ্ঠের নাম রমেশ। জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠ পনর বৎসরের ছোট। ভবেশই রমেশকে মানুষ করিয়াছিলেন। রমেশের পত্নী জয়ন্তী ভাশুরকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন—পুত্রদ্বয়ও ভবেশ-অন্ত-প্রাণ ছিল। রমেশ তেমন লেখাপড়া শিখে নাই। তাহার দিন হৈ হৈ করিয়া কাটিয়া যাইত। কখন যাত্রার দলে ঢোল বাজাইয়া, কখন প্রতিবেশীবর্গের ক্রিয়াকর্ম্মে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়া, কখন সাঁতার কাটিয়া বা কুস্তি লড়িয়া সে সময় অতিবাহিত করিত। তাহার দেহে ছিল অসুরের বল। অনেকে তাহাকে "হস্তী-মূর্খ" বলিয়া বিদ্রূপ করিত। মূর্খ হইলেও রমেশের সদ্‌গুণের সীমা ছিল না। আপদ বিপদে সে গ্রামবাসীদিগের প্রধান সহায়। কখন কাহার কি বিপদ্ ঘটে, এই জন্য সে রাত্রিতে ঘুমাইয়াও জাগিয়া থাকিত। গভীর রাত্রে ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া রমেশচন্দ্র বুঝিতে পারিল হতভাগিনী তারাসুন্দরীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখনই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া একাকী মৃতের সৎকার করিয়া আসিল। এইরূপ কর্ম্ম তাহার নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। গ্রামের লোকে তাহাকে "দিক্‌পাল" বলিয়া ডাকিত। ভবেশের বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ ভবেশকে, রমেশকে একটু কাজকর্ম্মে দিবার কথা বলিলে স্নেহময় জ্যেষ্ঠ

বলিতেন—"আহা থাক থাক—যে কটা দিন আমি আছি রমেশ খেয়ে খেলিয়ে বেড়াক!" রমেশকে কেহ কাজকর্ম্মের কথা বলিলে সে হো হো শব্দে হাসিয়া বলিত—দাদা আছেন, আমার পয়সা খায় কে?

এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেলে এক দিন ভবেশ রমেশকে ডাকিয়া বলিলেন—আমি ভাই কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণে যাইব স্থির করিয়াছি। এইবার তোমায় একটু কাজ কর্ম্ম করিতে হইবে। জান ত দাদা, কখন কিছু সঞ্চয় করি নাই!

দাদাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে শুনিয়া রমেশ ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় খুব খানিকটা কাঁদিল। ভবেশ অনেক বুঝাইলেন। রমেশ শেষে শান্ত হইয়া বলিল—"আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।" পরদিন রমেশচন্দ্র কুঠির এক সাহেবের কাছে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। অল্পাহকাল মধ্যে ভবেশচন্দ্র তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্ ধার্ম্মিক ও সঙ্গতিবান্ স্বগ্রামবাসী হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওরফে "চাটুয্যে মশাই"এর সহিত তীর্থযাত্রা করিলেন। ঘোষাল-গৃহ অন্ধকার হইল।

২

মলয়পুরে এক ভণ্ডতপস্বী ছিল—তাহার নাম ভজহরি ঠাকুর। লোকে ভবেশচন্দ্রের নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করিত—বিদ্যা বুদ্ধি, দয়া দাক্ষিণ্য, মহত্ত্ব উদারতা, আচার ব্যবহার ইত্যাদির জন্য তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার এই নাম, যশ ও প্রতিপত্তিতে ভজহরি হাড়ে হাড়ে চটিত এবং কিসে ভবেশচন্দ্রের ভিটায় ঘুঘু চরিবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিত।

ভজহরি প্রচার করিয়াছিল তাহার গুরুদত্ত নাম "কালী কৃষ্ণ সাধনভজন।" কালী—কৃষ্ণ— সাধন—ভজন—এই অদ্ভুত নামকরণের একটু বিশেষত্ব আছে। ভজহরি তন্ত্রমতে কালীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধ এবং যোগবলে কৃষ্ণময়। সাধন করিয়া সে কালীকে লাভ করিয়াছে—ভজন করিয়া তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে। এই জন্য গুরুদেব তুষ্ট হইয়া তাহার নাম দিয়াছেন 'কালীকৃষ্ণ', আর তাহাতে উপাধি ভূষিত করিয়াছেন 'সাধন-ভজন'। সে মূর্খ গ্রামবাসীদিগকে বলিত; তাহার গুরুর বয়স ন্যূনপক্ষে আড়াই শত বৎসর। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা; তিনি হরিদ্বারে থাকেন; ভক্ত ভজহরিকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে একখানি মেচ্‌লার উপর উপবেশন করিয়া

ধ্যানমগ্ন হন, আর তীরবেগে সেই গামলাখানি হরিদ্বার হইতে দেখিতে দেখিতে মলয়পুরের ঘাটে আসিয়া লাগে! কেহ কেহ ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করে—"কৈ বাবা, আমরা ত কখনও গুরুও দেখি নাই—গামলাও দেখি নাই!" ভজহরি তাহার উত্তরে বলে—"হায়রে, কমলেকামিনী কি সবাই দেখ্‌তে পায়!" ভজহরির ঘরে এক দিকে কালীমূর্ত্তি—এক দিকে রাধাকৃষ্ণ; এক দিকে ত্রিশূল মড়ার মাথা পঞ্চমকারের সরঞ্জাম—এক দিকে মালসাভোগের বিপুল আয়োজন। সাধুর বেশবিন্যাসও অভিনব—গলায় রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক ও তুলসীর মালা, কোমরে একটু বাঘছাল, গায়ে নামাবলী! তাহার মুখে কখনও 'কপালিনী', 'নৃমুণ্ডমালিনী'—কখনও 'রাধারমণ', 'গোপীবল্লভ' ইত্যাদি! লোক দেখিলেই তাহার ভাব আসিত। একবার যাহার সহিত কথা হইত, সে তাহাকেই শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া জাহির করিত। অনেক সময় অপরিচিত পথিককে ধরিয়া অযাচিতভাবে "তুই-তোকারি" করিয়া বলিত—তুই যে আমাদের পন্থী রে! তোর কপালের রেখা দেখে বুঝেছি তুই সাধক হবি!

ভজহরির কতকগুলা "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধ" শিষ্য বা পারিষদ্ ছিল। তাহাদের লইয়া কখনও সে মাভৈঃ মাভৈঃ করিত—কখনও বা কীর্ত্তন গাহিত। পাঁচটা লোক আসিলেই "শ্যামাশ্যাম শিবরাম, ঐ নাম আমি ভালবাসি" বলিয়াই ব্রাহ্মণ ধেই ধেই করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিত। "আয় তোদের দর্শন করাই" বলিয়াই সে আগন্তুক স্ত্রীলোকদিগের

চোখ টিপিতে থাকিত। চোখের উপরের পাতা টিপিলে অনেকসময় বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভজহরি জিজ্ঞাসা করিত—"কি দেখলে?" অনেকেই উত্তর করিত—"চক্ষের সম্মুখে রামধনুকের মত কি দেখা গেল!" "সাধু সাধু" বলিয়াই ভজহরি আহ্লাদে আটখানা! সে বুঝাইয়া দিত—ও রামধনু নয় "রামের ধনুক! মায়ের দয়া হয়েছে—অভিষিক্ত হয়ে এই বেলা ঘোর তন্ত্রের আশ্রয় লও—ন্যাস কুম্ভক প্রাণায়াম কর—উদ্ধার হয়ে যাবে।" সাধুর কথায় অনেকেই ভুলিত। বেচারা স্ত্রীলোকদিগের ভজহরির উপর খুব বিশ্বাস ছিল। তাহারা জানিত ঠাকুরের অসাধ্য কাজ নাই। সে তাহাদের বলিত—কি কালীমাতা, কি কৃষ্ণ দাদা, সব দেবতাই তাহার হাত ধরা; নিশীথ রাত্রে তাঁহাদের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা হয়। অনেকেই এই কথা বিশ্বাস করিত। ঠাকুর বশীকরণ, স্তম্ভন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সবই করিত; যুবতী ও প্রৌঢ়া-দিগকে কালীমন্ত্র দিত, পঞ্চমকার শিখাইত—বর্ষীয়সীগণকে বলিত—"তোমরা কৃষ্ণমন্ত্র লও—কৃষ্ণনাম কর।" হোম, যাগ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নাম করিয়া ভজহরি লোকের কাছে মালসা মালসা গব্য ঘৃত লইয়া তদ্দ্বারা দিব্য উদরের পরিচর্য্যা করিত। ফলে দেহখানি ঊর্দ্ধে অধঃ আশে পাশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মৈনাক পাহাড়টির মত হইয়াছিল। ভজহরি উত্তম অভিনেতা। অভিনয়ের কখন কোথাও কিছু ত্রুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সে তাহা সারিয়া লইতে পারিত। তাহার উপস্থিত-বুদ্ধিও অসাধারণ ছিল। একবার মিত্রগিন্নি হরসুন্দরীর কাছে ভাবের

ঘোরে সে বলিয়াছিল—"ওমা হরি হরি—তোর পায়ে ধরি!" হরসুন্দরী বলিলেন—"হাঁ বাবা, হরিকে মা ব'ল্লেন যে!" ভজহরি—"পাতকিনী, তুই তা জানবি কি বল"—বলিয়াই দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিতে লাগিল—"ও মা কালী কালী, তুই বনমালী! ও শ্যাম বনমালি, তুই কালী কালী!" হরসুন্দরী একেবারে চুপ!

অনেকে ভজহরিকে "কালীকৃষ্ণ ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত; কেহ কেহ বলিত "ঠাকুর বাবা"; বুড়ীর দল তাহার নাম রাখিয়াছিল—"সাধনভজন ঠাকুর!" ভবেশচন্দ্র লোকমুখে ভজহরির নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতেন—না কালী, না কৃষ্ণ; হিন্দুকুলে জন্ম—আচারে মুসলমান; বেটা 'কালীকৃষ্ণ' নয় 'রামতোবা'! ছি ছি, ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্ম—দেশ অধঃপাতে যাক্!

৩

যে কুঠিতে রমেশ কাজ করিত তথাকার বড় সাহেবের নাম মিঃ স্মিথ্। স্মিথ্ সাহেব কলির একটী অসুর; একটা মেড়া একলা উদরস্থ করিত—লেখাপড়ায় 'ক' অক্ষর গোমাংস—কুলিমজুর ও অপরাপর কর্ম্মচারীর উপর নির্য্যাতনে সিদ্ধহস্ত—তাহার উপর জালজুয়াচুরীও বেশ আসিত। কুঠির কেরাণীরা তাহাকে 'ব্ল্যাক স্মিথ' বলিয়া উপহাস করিত। রমেশকে কর্ম্মসূত্রে অনেকসময়েই সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইত। সাহেব ভাঙ্গা হিন্দিতে লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত। বিশ্বাসী বলিয়া রমেশের খুব খ্যাতি ছিল। সেইজন্য সে সাহেবের একটু সুনজরে পড়িয়াছিল। সে দশটাকা বেতনে ঢুকিয়াছিল। ছয় মাসের মধ্যে তাহার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভবেশ তীর্থযাত্রা করিবার পর সংসারে আর টাকা পাঠাইতে পারেন নাই। সুতরাং ঐ পনর টাকার উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে জয়ন্তী সংসার চালাইতেছিলেন। ভজহরি ঠাকুর মধ্যে মধ্যে তত্ত্ব লইতে আসিত। একবার রমেশের এক পুত্রের পীড়া উপলক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় ভজহরি কিছু কর্জ্জ দিতে চাহিল।

বুদ্ধিমতী জয়ন্তী কিন্তু রমেশকে সে কর্জ্জ লইতে দিলেন না— নিজের হাতে দুগাছি সোণার রুলি ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

এই ভাবে যখন দিন কাটিতেছে তখন একদিন সাহেব রমেশকে তলব করিল। রমেশ আসিয়া সেলাম করিবামাত্র সাহেব তাহাকে খুব আদর যত্ন করিয়া পাশের কেদারায় বসাইল। এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার রমেশের কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। সাহেব বলিল—টুমি কি করে?

রমেশ রসিক লোক; সেও ভাঙ্গা হিন্দিতে উত্তর করিল— হামি কাজ করে, খায় দায়, আর কাঁশি বাজায়।

সা। হামি টোমার ভাল করবে বলে ডাকলে।

র। হামি বাঁচলে।

সা। হামি শুনলে বীমা আফিস টোমার সাক্ষী সমন করলে। টুমি আডালটে কি বলবে?

র। কি আবার বলবো সাহেব। যা জানি তাই বলবো। হামি বলবো যে সাহেব আমাকে হুকুম দিলে আমি গুদাম খালি করে দিয়েছিলুম। বিশেষ কিছু আর লোকসান হ'ল না।

সা। টা হ'লে চলবে না ড়মেশ বাবু!

রমেশ মনে মনে হাসিল। 'ড্যাম, স্যাষ্টি, নিগার' ছাড়া যার মুখে বুলি নাই সে আজ কোলের কাছে বসাইয়া 'রমেশ বাবু' বলিয়া

ডাকিতেছে! একবার ভাবিল তাহার বৃহৎ ঠ্যাং দুখানা সাহেবকে দিয়া টিপাইয়া লয়। সাহেব বলিতে লাগিল—টোমার সাক্ষীর উপর মামলা চলবে। টুমি সট্টি কথা বল্লে হামি ড্যামেজ্ পাবে না। টুমি বলবে ডস্ লাখ টাকার মাল গুডামে ভর্ত্তি ছিল।

বিস্মিত হইয়া রমেশ উত্তর করিল—সে কি সাহেব, দশ পয়সার ও মাল যে ছিল না! তুমিই ত একদিন আমায় হুকুম দিলে, আর আমি চব্বিশঘণ্টার মধ্যে গুদাম চিচিংফাক্ করে ফেললুম!

স। সে বাট্ টো ঠিক আছে। এখন ঠিক কঠা বললে টো হামি টাকা পাবে না। টোমায় মিঠ্যা সাক্ষী ডিটে হোবে। টুমি ভাল লোক আছে।

সলম্ফে রমেশ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিল,—"রইলো সাহেব তোমায় নকরি। ভবেশ দাদার ভাই মিথ্যা বল্‌তে শেখেনি। কাঠ কেটে খাব সেও ভাল!"

সাহেবের সুর চড়িল। তাহার কাণ দুটা লাল হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়া বলিল—"ব্লাডিফুল, টুমি মিথ্যা সাক্ষী ডিবে কি না?"

রমেশ। কিছুতেই নয়।

সা। টুমি বডমাস আছে।

র। বাধিত হলুম, সেলাম।

রমেশ যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। সাহেব ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল; তারপর ঘুষি পাকাইল। রমেশের তখন ধৈর্য্য-

চ্যুতি ঘটিতেছিল। সে রক্তচক্ষে সাহেবকে বলিল—"সাবধান!" "চুপরও সুয়ার" বলিয়াই সাহেব রমেশকে এক চপেটাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে রমেশ বিরাশী সিক্কা ওজনের ঘুসিতে তার প্রত্যুত্তর দিল। সাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। গোলমালে পাঁচজন সে স্থানে আসিয়া পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সাহেব রমেশকে পুলিশের হাতে দিল।

৪

শ্রাবণ মাস। প্রবল বর্ষা। বৃষ্টির বিরাম নাই। তিন দিন ধরিয়া দুর্য্যোগ চলিতেছে। যেমনি ঝড়—তেমনি জল। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণা, পুষ্করিণী ভাসিয়া গিয়াছে, পল্লীপথ কর্দ্দমে পিচ্ছিল, অনেক স্থান জলমগ্ন। আজ সকাল হইতে আকাশের গতিক ভাল নয়। হাটে হাট বসে নাই—মাঝিরা খেয়া বন্ধ করিয়াছে—ধানের ক্ষেত জলে নিমজ্জিত—কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে।

এই বিষম দুর্য্যোগেও রমেশকে কর্ম্মস্থলে যাইতে হইয়াছে। ইংরাজ মনিব—কোনও আর্জ্জি শুনিবে না—তাহার কাজ চাই। সুতরাং ভোরের বেলা কয়েকটা কাঁঠালবিচি ভাতে ভাত খাইয়া ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। জয়ন্তী কত অনুনয় করিয়া বলিলেন—"না হয় ভিক্ষা করিয়া দিন যাইবে, অমন চাকুরীতে কাজ নাই।" রমেশ শুনিল না। বরং বলিয়া গেল—সে কি—দাদার হুকুম—শুনিব না? চাকুরী গেলে দাদা মনে করিবেন আমি গাফিলি করিয়াছিলাম।

জয়ন্তী অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই রমেশ—চিরসুখের ক্রোড়ে পালিত সাধু ভবেশচন্দ্রের প্রাণাধিক সহোদর সেই সৌখীন রমেশ—হাসিতে হাসিতে এই দুর্য্যোগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইবে– পায়ে জুতা নাই—মাথায় ছাতা নাই—গায়ে তেমন আবরণ নাই, হিমশীতল বাতাস—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি —সর্ব্বাঙ্গে যেন কাঁটা বিঁধিতেছে। তা হউক—তবু রমেশকে যাইতে হইবে। তা ছাড়া এই কয় মাস ভবেশচন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়াছেন—ইহারই মধ্যে যথেষ্ট অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জয়ন্তী অনেকদিনই গোপনে উপবাস করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় চাকুরী ছাড়িলে দুর্দ্দশার যে অবধি থাকিবে না রমেশ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। তাহার উপর দাদার অনুরোধ! দাদার বাক্য বেদবাক্য। রমেশ কি চাকুরী ছাড়িতে পারে?

রাত্রি হইল। জয়ন্তী সকালকার চারিটী ভিজা ভাত ছেলে দুটীকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইলেন। রাত্রির সঙ্গে দুর্য্যোগও বাড়িতে লাগিল। রমেশ ফিরিল না। জয়ন্তীর ভয় ভাবনার অন্ত নাই। তিনি শুধু ঘর আর বাহির করিতেছেন। বিদ্যুৎ বিকটদৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে আকাশভরা সেই জমাট কালমেঘের রাশি দেখাইতেছে; সমীরণ অট্টহাসে হতভাগিনীর দীর্ঘ-শ্বাসকে উপহাস করিতেছে; বজ্র ভৈরব নিনাদে ভয়কাতরার বুকখানি ভাঙ্গিয়া দিতেছে!

হঠাৎ বহির্দ্বারে শব্দ হইল। "যাই"—বলিয়া উন্মাদিনী উৎফুল্ল ও আশ্বস্ত হইয়া ছুটিলেন। প্রাঙ্গণ হইতে তিনি বলিলেন—আঃ বাঁচলুম! বড় কষ্ট হয়েছে—না?

দরজার ফাটাল দিয়া জয়ন্তী একটা লণ্ঠনের আলো দেখিয়া ভাবিলেন—এ কি! তিনি ত লণ্ঠন লইয়া যান নাই! পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, হয়ত কুঠির সাহেব দয়াপরবশ হইয়া একটী লণ্ঠন দিয়াছেন। আহা সাহেবের মঙ্গল হোক—তিনি গরীবের মা বাপ!

বাহির হইতে কে ডাকিল—"ছোট-বৌ—অ ছোট-বৌ"! যদি বজ্র আসিয়া জয়ন্তীর মাথায় পড়িত—যদি সারা বিশ্বটা তাঁহার সম্মুখে সহসা চূর্ণ হইয়া যাইত—তাহা হইলেও তিনি এরূপ বিস্মিত হইতেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একখানা ছায়াচিত্রের ন্যায় তিনি প্রাঙ্গণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী! রাধারমণ হে—তুমিই ধন্য! পার কর হে পতিতপাবন—আমার সাধ নাইক অন্য!" কথা কয়টি জয়ন্তীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন ভজহরি আসিয়াছে; নিশ্চয়ই ব্যাপার কিছু গুরুতর। দ্বার খোলা উচিত কিনা তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

মিহিস্বরে ভজহরি বলিল—মালাইদাস, একবার রাধাশ্যাম বল! বল কালী কৈবল্যদায়িনী! এস মালাই দুভাই যাই পারে, আমার একলা যেতে ভয় করে!

জয়ন্তী এক পা অগ্রসর হন—আবার দুই পা পিছাইয়া আসেন।

বাহির হইতে ভজহরি একটু জোর গলায় বলিল—ছোট-বৌ, দ্বার খোল, রমেশ ভায়ার বিষয়েই একটা পরামর্শ ক'রতে এসেছি। শ্রীনন্দনন্দন হে রক্ষা কর! কালী কালভয়হারিণী!

জয়ন্তী আর থাকিতে পারিলেন না—একহাত ঘোমটা টানিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। "ব্রজের দুলাল এ সংসারে তুমিই সার"—বলিতে বলিতে ভজহরি প্রবেশ করিল। সঙ্গে মালাইদাস। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য—দুষ্ট ভজহরির দুর্দ্দান্ত সহকারী! প্রভুর যখন 'ভর' হয়, মালাই তখন তাহার ঘর বাড়ী চৌকি দেয়—পাছে কোনও দুষ্ট লোক গোলমালে কিছু লইয়া পলায়ন করে। মালাইএর নাড়ীজ্ঞান দিব্য। কোন্ ভক্ত শাঁসাল, কে ভাঁড়ে মা ভবানী, কাহার সর্ব্বনাশ করা সহজ, দু'এক কথায় তাহা বুঝিতে পারে। কখন কিরূপ অভিনয় করা আবশ্যক সে প্রভুকে তাহার ইঙ্গিত করে। টেলিগ্রাফের কোডের মত তাহাদের একপ্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা ছিল। প্রয়োজন হইলে পরস্পরে তাহার ব্যবহার করিত। ভজহরি-মালাই-তত্ত্ব জানিতে হইলে ঐ সাঙ্কেতিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, নতুবা তোমায় 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' থাকিতে হইবে।

মালাইদাসের চেহারাটি বেশ নধর, উদরটী মথুরার চৌবের ন্যায় বর্ত্তুলাকার, ভোজন ফুল্লরাতনয় কালকেতুর মত। বোধ হয় দশ গণ্ডা মথুরার চৌবে ভাঙ্গিয়া একটী মালাইদাস তৈয়ারী

হইয়াছে। বাবাজী রং ঢং-এ সিদ্ধপুরুষ, লোক ভুলাইতে অদ্বিতীয়। প্রত্যহ প্রাতঃ-সন্ধ্যায় আহ্নিকের ছলে ঘাটে বসিয়া আড়চক্ষে আগন্তুক স্নানার্থিনী যুবতীবৃন্দের বেশবিন্যাস রূপযৌবন দেখিত। সুকণ্ঠ মালাইদাস অনেক সময় স্ত্রীলোক দেখিলেই কীর্ত্তন আরম্ভ করিত—গান গাহিতে গাহিতে ভাবের ঘোরে তাহার দুই চক্ষে বসুধারা ছুটিত। অনেকে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সাধুর চরণে প্রণত হইত। মালাইদাস শীকার ধরিয়া প্রভুপাদের পাদমূলে উপহার দিত। ফলে, উভয়েরই একাদশ বৃহস্পতি।

জয়ন্তী প্রাঙ্গণের কোণে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছেন। ভয়ে ভাবনায় তাঁহার বুক গুড়্ গুড়্ করিতেছে। মালাইদাস ভজহরির মাথায় ছাতি ধরিয়া আছে। ভজহরি কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া 'জয় গুরু—জয় গুরু' বলিয়া কহিল - ছোট-বৌ, ভেবো না—সবই আমার সেই শ্রীরাধারমণের ইচ্ছা !

জয়ন্তী কখনও সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া ভজহরির সহিত কথা কন নাই। আজ তিনি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলেন - কেন—কি হয়েছে ?

ভজহরি। কি ব'লব ছোট-বৌ—সবই সেই লীলাময়ের লীলা ! নইলে সোণারচাঁদ রমেশের এমন মতি হবে কেন ? শঙ্কর—মনের ময়লা দূর কর !

জয়ন্তী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—কাদার উপর বসিয়া

পড়িলেন। ভজহরি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—দেখ ছোট-বৌ, রমেশ কুঠির সাহেবকে খুন করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে।

জয়ন্তী 'সে কি' বলিয়া মূচ্ছিতা হইলেন। জয়ন্তীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া মালাইদাস ভজহরির কাণে কাণে বলিল—দেখ দাদা, মাগী বড় চালাক—তোমায় একটু জম্পেশ রকম অভিনয় ক'রতে হবে। নতুবা ওর কাছ থেকে কিছু আদায় হবে না। হয়ত ছোঁড়া-ছুটোর হাত ধ'রে তদ্বির ক'রতে নিজেই বেরোবে!

ভজহরি আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"তালে ঠিক আছি ভায়া। উপস্থিত মাগীটার মুখে একটু জলের ঝাপটা দাও।" মালাই তাহাই করিল। কিয়ৎপরে জয়ন্তীর চৈতন্য হইল। তিনি তাড়াতাড়ি অঙ্গে বস্ত্রা'দ টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। ভজহরি পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল—যেন কিছু দেখিয়াও দেখে নাই। চোখের জল তাহার অনুগত ভৃত্যস্বরূপ ছিল। মনে করিলেই গুরুশিষ্যের দুই চক্ষে মন্দাকিনী বহিত। ভজহরি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বলিল—"কোথায় গোপীবল্লভ, একবার দেখা দাও—আমার রমেশকে বাঁচাও!" ব্রাহ্মণ যতই নাম গান করিতেছে—ততই কাঁদিতেছে। মালাইদাস প্রভুপাদের চোখের জল মুছাইয়া দিতেছে। হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া মালাইদাস জয়ন্তীকে বলিল—ধৈর্য্য ধর মা। ঠাকুর যখন কৃষ্ণপদে তোমার স্বামীর জন্য জানাইতেছেন, তখন শ্রীভগবান্ তাঁকে মুক্ত ক'রবেন।

শোকে দুঃখে ভয়ে ভাবনায় অভিভূত হইয়া জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ বাবা, কি হ'য়েছিল ?

মালাইদাস বলিল—সাহেব রমেশ বাবুকে রাগ করে মারতে গিয়েছিল—রমেশ তাই এক আঘাতে সাহেবকে খুন করেছে।

মালাইদাসের কথায় বাধা দিয়া ভজহরি বলিয়া উঠিল—কৃষ্ণহে—তুমি কোথায় ! পারের কাণ্ডারী পার কর। দেখ ছোট-বৌ—আমার এক ভক্ত ঐ কুঠিতে কাজ করে। তার কাছে আমি সকলই শুনলাম। রমেশ আমায় তার দ্বারা কয়েকটী কথা বলে পাঠিয়েছে। যে হাকিমের কাছে বিচার হবে—সে আমার শিষ্য। একটু তদ্বির করতে পারলেই রমেশ বেকসুর খালাস—আর সঙ্গে সঙ্গে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে'—সাহেবের ফাঁসী ! রক্ষা কর মা রক্ষাকালী !

জয়ন্তী। কি করলে উপায় হয় ?

ভজহরি—পথ দেখাও হরি ! বলব কি ছোট-বৌ, উপায় এখন চাঁদি। চাঁদির কাছে সবাই বাঁদি। দয়াল হরি—তুমি কোথায় গেলে ? জান ত ছোট-বৌ, কামিনী-কাঞ্চনের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নাই। দানপত্র কোরে ঘরবাড়ী অৰ্দ্ধেক দিয়েছি রাধাশ্যামকে—আর অর্দ্ধেক দিয়েছি আমার সেই আলোকরা কালো মেয়েকে ! এখন দেখ্‌ছি আমি বিনে রমেশ যায়। কুলকুণ্ডলিনী জাগো—জাগো—মুখ তুলে চাও ! ছোট-বৌ—কি বল ?

ভজহরির এই অকৃত্রিম ভক্তি ও পরোপকারপ্রবৃত্তি দেখিয়া অসহায়া জয়ন্তীর পূর্ব্ববিশ্বাস বিচলিত হইল। তিনি ভজহরিকে নীচপ্রকৃতি বলিয়া জানিতেন—তাঁহার সে ধারণা দূর হইল। তজ্জন্য তিনি মনে মনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল হয়ত অকূলে কূল পাইলেন—বুঝি বা মুস্কিলে আসান হইবে। কিন্তু যখনই ভাবিলেন অর্থ ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই তখনই তাঁহার সেই আশার ক্ষীণ আলোকটুকু নিভিয়া গেল—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—হিমক্লিষ্ট দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইল—মেঘের মসী আরো গাঢ়তর হইয়া উঠিল—ছিন্ন-বেতসীর প্রায় তিনি ভূপতিতা হইলেন। মালাইদাস আহ্লাদে আটখানা হইয়া প্রভুকে জানাইল—ঠিক হ'চ্ছে—এখনই কাজ সমাধা হবে—কাল মাগীকে বলতে হবে—'আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান!'

ভজহরি সানন্দে উত্তর করিল—ঠিক ব'লেছ মালাইদাস! যে সব চমৎকার চমৎকার বাসনের গোছা নিয়ে মাগী প্রত্যহ এক প্রহর ধ'রে ঘাটে বসে মাজে—সে সব জিনিস কি ওর ঘরে শোভা পায়। তা ছাড়া একলা মানুষ—খেটে মরিস কেন—ভাঁড়ে জল খা—পাতে ভাত খা—চুকে গেল! ওসব আপদে কাজ কি? শ্রীহরি দয়া কর!

অনেকক্ষণ পরে জয়ন্তী উঠিলেন। মালাইদাস বলিল—মাগো, ভাবনার সময় নেই। রমেশ বাবুকে বাঁচান। ঘরে তৈজসাদি যা

আছে—সেই সব বন্ধক দিয়ে কিছু কর্জ্জ ক'রুন। এখনই টাকা নিয়ে গ্রামান্তরে ছুটতে হবে। আর প্রভু যখন এ কাজে হাত দিয়েছেন তখন আমাদের রমেশ বাবু ত ঘরেই এসেছেন ধ'রে রাখুন।

ভজহরি মালা জপিতে জপিতে "জয় গুরু" "জয় গুরু" নিনাদ করিতে লাগিল।

জয়ন্তী বলিলেন—সবই ত বুঝলুম, ঘটিবাটিও না হয় বন্ধক দিলুম, কিন্তু এ রাত্রে টাকা দিবে কে?

ভজহরি উৎফুল্লভাবে শ্রীহরির নাম করিতে করিতে বলিলেন—"ভেব না ছোট-বৌ, ভেব না—সতীসাধ্বী তুমি—তোমার চোখের জল দেখে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া ভজহরি কাঁদিয়া উঠিল। মালাইদাসের শুশ্রূষায় শেষটা শান্ত হইয়া বলিল—না হয় নিজেই শিষ্যগৃহে গিয়া পড়ি। হরিহে—দয়া কর! কপালিনী—তুমি কোথায়? যাও ছোট-বৌ—তৈজসাদি নিয়ে এসো।

জয়ন্তী আশ্বস্ত হইয়া তৈজস আনিতে গেলেন। দুই সাধু আহ্লাদে ডগমগ হইয়া শ্রীহরির নাম করিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। ন্যূনকল্পে একশত টাকা চাই—বড় বড় ঘড়া হইতে নুন খাইবার রেকাবীখানি পর্য্যন্ত জয়ন্তী আনিয়া দিলেন। সেই বিপুল দ্রব্যসম্ভার মাথায় করিয়া অনাথিনীকে পথে বসাইয়া দস্যুদ্বয় প্রস্থান করিল।

৫

হাকিমের সম্মুখে রমেশ সত্য কথাই বলিল; বিচারে তাহার তিনমাস কঠোর কারাদণ্ড হইল।

অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন সাহেবকে প্রহার করায় রমেশচন্দ্রের মাত্র তিন মাস কারাদণ্ড হইল কেন? ইহার একটু কারণ আছে। প্রহারের কথাটা লজ্জায় সাহেব একেবারে হজম করিয়াছিল—সাহেব শুধু গালি দেওয়ার অপরাধে রমেশকে অভিযুক্ত করিয়াছিল। সেই জন্য লঘু দণ্ডে বেচারা অব্যাহতি পাইল। রমেশের সে নিদারুণ চপেটাঘাত সাহেব আজীবন ভুলিতে পারে নাই। তাহারই ফলে অষ্টাহকাল মধ্যে তাহার Facial paralysis) মুখে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রমেশ জেলখানা হইতে খালাস হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ্ তল্পী গুটাইয়া বিলাত যাত্রা করিল। রমেশ একটা চাপড়ে কুঠির সাহেবদের দিব্যজ্ঞান আনিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি আর কোনও সাহেব অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও কুলিমজুরদের প্রতি জোরে কথা কহিতেও সাহস করিত না।

দলু সর্দ্দার বলিয়া একজন সর্দ্দারকুলি রমেশকে বড় শ্রদ্ধা করিত। শ্রদ্ধার কারণ—একবার সে রমেশকে ঘুস দিয়া কিছু মাল আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চরিত্রবান্ রমেশ ওরূপ দুষ্কর্ম্ম

করিতে তাহাকে নিষেধ করে। এই সূত্রে রমেশ সর্ব্বদাই তাহাকে নজরে রাখিত। সর্দ্দারকুলিও রমেশের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সৎসঙ্গে পড়িয়া সর্দ্দারের মতি ফিরিল—জীবনে সে আর কখনও কোনও দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই।

রমেশচন্দ্র দলু সর্দ্দারকে নিজের সংসারের কথা, দুঃখকষ্টের কথা, অগ্রজের কথা—সব বলিত। দলু মধ্যে মধ্যে রমেশের বাড়ী আসিত। সে জয়ন্তীকে 'মা-ঠাকুরাণী' বলিয়া ডাকিত। জেলে যাইবার সময় রমেশ দলুকে বলিয়া গেল—সর্দ্দার ভাই, আমি জেলে চলিলাম, তোমার মা ও ভায়েদের দিনপাতের একটা উপায় করিবার চেষ্টা করিও। পৃথিবীতে আপনার বলিবার আমার আর কেউ নেই। দাদা ভগবৎ-চরণে আশ্রয় নিয়েছেন—এখন তিনি হরিদ্বারে, শীঘ্রই বদরিনারায়ণ দর্শনে যাবেন ব'লে লিখেছেন। তাঁকে কোনও কথা যেন না লেখা হয়। তাতে তাঁর ধর্ম্মচর্য্যার বিঘ্ন হবে। আমার নাম ক'রে তোমার মাকে সমস্ত কথা জানিও।

রমেশকে যখন পাহারওয়ালারা জেলে লইয়া যায় তখন দলু সর্দ্দার বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। যদি একজনের বদলে আর একজন ইচ্ছা করিলে জেল খাটিতে পারে এরূপ কোন নিয়ম থাকিত, তবে দলু সর্দ্দার সর্ব্বাগ্রে রমেশকে মুক্ত করিত। দলু জোরগলায় রমেশকে বলিল—"দাদাঠাকুর, ভেবো না—আমি আমার মা ভাইদের দেখব।" রমেশ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু অদৃষ্ট যাহাকে পরিহাস করে

তাহার কি কোথাও নিষ্কৃতি আছে ? রমেশ মূর্খ বটে—কিন্তু সে ধার্ম্মিক চরিত্রবান্, পরোপকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ; তবু তার এত কষ্ট কেন ? ভবেশচন্দ্র যার অগ্রজ—দলু সর্দ্দার যার সেবক—ধর্ম্ম যার আশ্রয়—কর্ম্ম যার কর্ত্তব্য—সে কেন বিনাপরাধে জেলখানায় ঘানি টানে—তার স্ত্রীপুত্র কি জন্য অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটায় ? কেন তা জানি না। কিন্তু এরূপ বিরল নহে। বিধাতার বিচিত্র বিধান ! নতুবা মৃগ আবার কখনও সোণারূপার হইয়া থাকে ? কিন্তু ঐ দেখ সেই ভীষণ রাক্ষসসমরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাদেবী সোণার মৃগের জন্য লালায়িত—আর স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ হস্তে সোণার মৃগ মারিতে উদ্যত ! ঐ দেখ—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্যবিধাতা মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া মহাশ্মশানে মৃতের কম্বল আহরণ করিতেছেন ! ঐ পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া নারীশ্রেষ্ঠা পত্নীকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় করিতেছেন ! আবার দেখ—নরপতি নল নিবিড় অরণ্যমধ্যে নিরপরাধা নিতান্ত করুণা-প্রার্থিনী কায়মনোবাক্যে একান্ত অনুগামিনী অঙ্কশায়িতা নিদ্রাভিভূতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ! এ সকল জীবনের মহানাটকের কথা ! ইহার কারণতত্ত্ব জানিতে গেলে নিয়তির কাছে যাইতে হয়। নিয়তি সকল দেশে সকল সময়ই এই রকম করিয়া থাকেন। নিয়তি কাহারও বাধ্য নহেন। ধার্ম্মিক রমেশ আজ নিয়তির নিষ্ঠুর নিগড়ে আবদ্ধ। তাই আজ—

অদৃষ্টের পরিহাস

"অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়,
হের লক্ষ্মী হল লক্ষ্মীছাড়া !"

দলু সর্দ্দারের উপর স্ত্রী-পুত্রের ভার দিয়া রমেশচন্দ্র জেলখানায় প্রবেশ করিল। দলু স্থির করিল, যে সাহেব তাহার পিতৃতুল্য রমেশের এমন নিগ্রহ করিয়াছে— যাহার জন্য আজ তার মা-ভাইরা পথের ভিখারী —সেখানে আর সে চাকুরী করিবে না। দলু চাকুরীতে ইস্তফা দিবার জন্য কুঠিতে ফিরিয়া গেল। সাহেব তখন বারাণ্ডায় আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া বিশ্রাম করিতেছে। তাহার একগালে কালরঙের প্রলেপ—আর একগাল সাদা ধব্ধবে! চপেটাঘাতের ব্যথা নিবারণের জন্য ঐ কাল প্রলেপ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাহেব সেই অবধি হাঁ করিতে পারে না। আজ কয়দিন চোঙ্গ্ দিয়া একটু দুধ ছাড়া কর্ত্তা আর কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারেন নাই! চড় খাওয়া অবধি তার মনে হইতেছে বুঝি ধড়টা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন! কোথায় আধসিদ্ধ একটা মেড়া ভোজন, আর কোথায় মেজার গ্লাসে একছটাক দুগ্ধপান! সাবাস বাঙ্গালী! ধন্য রমেশ! ধন্য তোমার চপেটাঘাত!

দলু দূর হইতে সাহেবের মুখে চুণ-কালি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল। মনে মনে গালিবর্ষণ করিতে করিতে সে সাহেবের কাছে গিয়া চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কয়দিনের বেতন চাহিল। সাহেব গোঁয়াইয়া গোঁয়াইয়া তাহাকে বলিল—পূর্ব্বে নোটিস না দিয়া গেলে ছিটকড়িও মিলিবে না!

দলু কলা দেখাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। নদীতীরে আসিয়া দলু দেখিল বন্যা আসিয়াছে। একখানিও খেয়া নৌকা নাই। নদীর কাল জলের সঙ্গে প্রাবৃটের কাল মেঘ কথা কহিতেছে—ঢেউগুলা দুষ্ট ছেলের মত মাথা তুলিয়া বাতাসের সঙ্গে লড়াই করিতেছে। আকাশ-জোড়া কাল মেঘের উপর মুহুর্মুহু আঁকিয়া বাঁকিয়া বিদ্যুৎ খেলিতেছে। নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া দলু সর্দ্দার কেমন করিয়া পার হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ওপারে তাহার বাড়ী। কুঠি হইতে সে রিক্তহস্তে আসিয়াছে। সুতরাং বাড়ীতে না গেলে পয়সা পাইবে না। পয়সা না লইয়া রমেশের গৃহে যায় কেমন করিয়া? সর্দ্দার ভাবনায় পড়িল। সহসা দেখিল পাল তুলিয়া কিয়ৎদূরে একখানা নৌকা তীরবেগে ছুটিতেছে। দলু অনেক চীৎকার করিল। নদীর কল্লোলে, বাতাসের শব্দে তাহার স্বর ভাসিয়া গেল। তখন সে সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিবার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিল। শরীরে অসুরের বল থাকিলেও সে ভীষণ স্রোতোবেগ প্রতিহত করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রাবৃট-দিনান্তকালে বীচিবিক্ষেপচঞ্চলা নদীবক্ষে ভাগ্যহীন রমেশের তৎ-কালীন একমাত্র হিতৈষীর ঘটনা-বিহীন জীবননাটকের যবনিকা পড়িয়া গেল!

৬

ঘোষালবাড়ীর যাবতীয় মূল্যবান্ তৈজসাদি ভজহরির গৃহে গিয়া উঠিল। মালাইদাস বামালসকল সাবিত্রী গোয়ালিনীর বাটীতে রাখিবার জন্য তাহার প্রভুকে পরামর্শ দিল। এই প্রসঙ্গে সাবিত্রীর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। সাবিত্রী ভজহরির উপপত্নী। মলয়-পুরে সবাই তাহাকে গোয়ালিনী বলিয়া জানে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একজন বাগ্দিনী। সে ভিন্ন গ্রামে থাকিত। ভজহরিই তাহাকে গোয়ালিনী সাজাইয়া স্বগ্রামে আনে। সবাই জানে, সাবিত্রী প্রভুপাদের প্রধানা শিষ্যা। সাবিত্রী দুইবেলা কেঁড়ে বগলে অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ-শূদ্রের অন্দরমহলে দুধ দিতে যায় এবং বৌঝিদের সহিত বসিয়া অবাধে গানগল্প, রঙ্গরহস্য করিয়া থাকে। সাবিত্রীকে গোয়ালিনী সাজাইবার ভজহরির উদ্দেশ্য ছিল। যে প্রতারণা-জাল পাতিয়া সে ব্যবসা চালাইতেছিল তৎসম্পর্কে অনেকসময় লোকের অন্দরের খবর তাহার প্রয়োজন হইত। সাবিত্রী এ সকল ব্যাপারে তাহার প্রধান গোয়েন্দা। ভজহরির শিক্ষা-দীক্ষায় সেই চরিত্রহীনা বাগ্দিনী খুব বাক্পটিয়সী হইয়াছিল। তাঁহার চাতুরীতে ভুলিয়া অনেকেই ভজহরির জালে গিয়া পড়িত।

মালাইদাসের কথায় ভজহরি প্রথমে সাবিত্রীর গৃহে মাল রাখিতে সম্মত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মত বদলাইয়া গেল। সে বলিল—"না হে মালাইদাস, সেখানে মাল রাখা হবে না—চাণক্য সূত্রটা বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। বিশ্বাসোনৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ! বুঝলে ভায়া, একে স্ত্রীলোক—তাহাতে আবার উপসর্গসংযুক্ত। সোণায় সোহাগা! ওকাজ ক'রতে নাই। শাস্ত্র লঙ্ঘন করা মহাপাপ!" তখন গুরুশিষ্যে মিলিয়া মহানন্দে ভবেশচন্দ্রের পিতৃপিতামহের সঞ্চিত, সযত্নে রক্ষিত তৈজসাদি সিন্দুকে সাজাইয়া রাখিল। সে কার্য্য সমাধা হইলে ভজহরি বলিল—মালাইদাস, আর একটা কাজ আছে। সেটা না সম্পন্ন ক'রতে পারলে ভবেশ বেটার নামযশ ডুববে না—তার বাস্তুভিটাতেও ঘুঘু চ'রবে না!

মালাইদাস। কি কাজ, আজ্ঞা কর দাদা।

ভজহরি। একখানা খত প্রস্তুত ক'রতে হবে। এ গাঁয়ে কেউ জালিয়াৎ আছে কি?

মালাইদাস। কুমারপাড়ায় দুঃখীরাম নামে একজন গুলিখোর ছিল। সে এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। বহুদিন পূর্ব্বে সে একবার আমার এক বন্ধুর জন্য জাল ক'রেছিল। ফলে বন্ধু আমার বেশ শাঁসাল রকম এক ব্রহ্মোত্তর লাভ করে!

ভজহরি। আমারও তাই চাই। ভবেশ আমার কাছে পাঁচ শত টাকায় তার ভিটা বন্ধক রেখেছে—এই রকম একখানি

খত করাতে হবে। ভবেশের সই আমার কাছে আছে।

মালাইদাস। বেশ তাই হবে। আমি দুঃখীরামকেও চিনি—তার বাড়ীও জানি। কিন্তু দাদা, বাইরে থেকে আমি তোমায় তার বাড়ী দেখিয়ে দেব—নিজে তার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারব না!

ভজহরি। কেন ভায়া, জাল জুয়াচুরীতে এই নূতন নাকি—না ধরা প'ড়বার ভয়?

মালাইদাস। রামচন্দ্র! মালাইদাস ভয় জানে না।

ভজহরি। তবে কি সে তোমার ভাশুর না কি?

মালাই। তারও বাড়া। আমার যে বন্ধু তাকে দিয়ে জাল ক'রিয়েছিল সে আমার মারফৎ দুঃখীরামকে তার পারিশ্রমিক হিসাবে পঞ্চাশটী টাকা পাঠিয়েছিল। আমি কিন্তু অনেক বিবেচনার পর টাকাগুলি কৃষ্ণ-সেবায় সমর্পণ করি। দুঃখীরামের কাছে আমি সেই পর্য্যন্ত ফেরার!

ভজহরি। উত্তম—তবে তুমি নেপথ্যেই অবস্থান ক'রো!

পরদিন দুই বন্ধু মিলিয়া দুঃখীরামের সন্ধানে বাহির হইল।

৮

জয়ন্তীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মালাইদাস ঠিকই বলিয়াছিল—'আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান!' দিন অচল—ভাতের উপর নুন জুটে না! লাজলজ্জা ভুলিয়া জয়ন্তী ভবেশচন্দ্রের নিতান্ত অনুগত দুই-চারিজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অনিচ্ছায় তাঁহারা কেহ কেহ যৎকিঞ্চিৎ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন—কিন্তু এমন ভাবে কথা কহিলেন যে জয়ন্তী দুঃখ জানাইবার জন্য আর না যাইতে পারেন। অনেকে একেবারে মুখ ফিরাইল—দুই একজন অন্তর টিপ্‌নি দিতেও ছাড়িল না। হরসুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল জ্বালাস নি বোন্—ভবেশ ঠাকুর ঢের পয়সা রেখে গেছে—পায়ের উপর পা দিয়ে খেগে না! আমাদের কাছে আর লুকোচুরী কি? আর রমেশ—তার কথা আর কি ব'লব বোন্—নোটো গুণ্ডা—একেবারে সাহেব খুন! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—অমন সোয়ামীর কাঁথায় আগুন—তার জন্য আবার ভাবনা!

জয়ন্তীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়িতে লাগিল। বড় ছেলেটী সেয়ানা হইয়াছে, সে লোকজনদের ভাবগতিক বুঝিয়া মাকে আর কোথায়ও যাইতে দিত না। বাড়ীতে তৈজসাদি আর কিছু নাই। এইবার আসবাবপত্র বিক্রয়ের পালা। গ্রামের লোক—আত্মীয়-

কুটুম্ব বাহিরে বাহিরে এ সকল ব্যাপার শুনিতে লাগিল—কিন্তু সাহায্যের ভয়ে কেহ আর অগ্রসর হইল না। হারে দুনিয়া! কয়েক-মাস পূর্ব্বে ভবেশচন্দ্রের স্বগৃহে অবস্থানকালে যখন অর্থের অনটন ছিল না—দোল দুর্গোৎসব হইত—তখন আত্মীয় কুটুম্ব সম্পর্কীয় অসম্পর্কীয় প্রবাসী প্রতিবেশী প্রভৃতি সকলের আসা যাওয়ার ধূম কি! কেহ ভিয়েনশালে—কেহ হাটবাজারে—কেহ গৃহমার্জ্জনায়—কেহ আগ-ন্তুকের অভ্যর্থনায়—কেহ পরিবেশনে—কেহ তাস-পাশা-খেলায় মত্ত! পাঁচ সাত জন প্রতিবেশিনী শুধু জয়ন্তীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা—নতুবা ছাঁদা লইবার সুবিধা হয় না। চব্বিশ ঘণ্টাই ঘোষালগৃহে যেন অর্দ্ধোদয় যোগের জনতা! আর আজ সব ভোঁ ভাঁ। পয়সা নাই—সঙ্গে সঙ্গে পয়সার পোকা—ডাল ভাতের পোকা—অসার অপদার্থ পরান্নভোজীর দল—সব সরিয়া পড়িয়াছে! জয়ন্তী, তুমি সপুত্র অনাহারে মর—সেও ভাল, তথাপি আর কখন কাহারও দ্বারে গিয়া দাঁড়াইও না! এ পৃথিবীতে সবই বিপরীত। উপকারের প্রত্যুপকার নাই—দানে পুণ্য নাই ব্যথার ঔষধ নাই—গরীবের অন্ন নাই—ধার্ম্মিকের নিস্তার নাই, সুতরাং তোমারও স্থান নাই। সাহসে বুক বাঁধ নারী—হৃদয়কে বজ্র-কঠিন কর—সেই লোকে যাও—যেখানে সূর্য্য আছে, জ্যোতি নাই—নক্ষত্র আছে, দীপ্তি নাই—যেখানে সাগরে অগ্নি - নদীতে উত্তপ্ত বালুকার তরঙ্গ, যেখানে বৃক্ষ ফলপ্রসূ নয়, শুধু কণ্টকে পরিপূর্ণ—বাতাসে বিষ—সেই মহান্ধকারময় লোকে যাও!

গ্রামবাসীর হাবভাব দেখিয়া ছেলেদের শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বুদ্ধিমতী জয়ন্তী সাহসে বুক বাঁধিলেন। যথাসময়ে ভজহরি রমেশের কারাদণ্ডের খবর দিয়া জানাইল—তাহারই চেষ্টায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্ত্তে মাত্র তিন মাস জেল হইল; তদ্ব্যতীত জেলদারোগা প্রভৃতিকে ঘুস খাওয়াইয়া আসিয়াছে—রমেশ রাজার হালে থাকিবে!

ভজহরি আরও বলিল—১০২৸/১২৸ একশত দুই টাকা নয় আনা আড়াই পয়সা খরচ হইয়াছে, কিন্তু বন্ধক দিয়া একশত টাকার বেশী পাওয়া যায় নাই। যাহা হৌক—দুই টাকা নয় আনা আড়াই পয়সা যাহা তাহার নিজের তহবিল হইতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা আর জয়ন্তীর দিতে হইবে না।

জয়ন্তী ভজহরির কোনও কথায় উত্তর দিলেন না। সাধু "পার কর হে পতিত পাবন" বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল।

———

৮

মলয়পুরে কুমারপাড়ায় অনেকগুলি কুমারের বাস। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে কুমারের ব্যবসা ভালই চলিত। লোক থাকিলেই আহার্য্য চাই—সুতরাং হাঁড়ি-সরারও প্রয়োজন। কাজেই কুমারদিগের সকলেরই চালে খড়, পুকুরে মাছ, মরাইএ ধান, মাচায় শাক, অল্প-বিস্তর তেজারতি ইত্যাদি ছিল। বাংলার সে দিন বদলাইয়াছে। এখন অনেক পল্লীগ্রাম খানাতল্লাস করিলেও একটা কুমার মিলে কি না সন্দেহ!

কুমারপাড়ার এক প্রান্তে একখানি জীর্ণ কুটির। কুটিরখানি এত জীর্ণ যে আর দুএকটি বর্ষার ঘা সহ্য করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। দুইখানি মাত্র ঘর। তাহার সম্মুখে একটু দাওয়া। একটি ঘরের চাল একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় গৃহখানির কিয়দংশ মাত্র জীর্ণ গোলপাতায় ঢাকা; তাহাতে জলও পড়ে, হাওয়াও খেলে, চাঁদের আলোও উঁকি মারে! একটি ছোট প্রাঙ্গণ আছে। সেখানে দুএকটি পেয়ারা গাছ! গৃহকর্ত্তাকে অনেক সময় তোড়জোড়-হাতে সেই গাছতলায় বসিয়া মৌতাত সেবন করিতে দেখা যায়। সমৃদ্ধ কুমারপাড়ায় গুলিখোর দুঃখীরামের ন্যায় দুঃখী আর কেহ নাই। তা বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন

যে দুঃখীরাম জাতিতে কুম্ভকার। দুঃখীরাম ধীবর। অকর্ম্মা নেশাখোরকে সকলে একঘ'রে করিয়াছিল বলিয়া রাগ করিয়া সে এখানে আসিয়াছে। দুঃখীরামের এক ছেলে—আবগারী বিভাগ তাহার একচেটিয়া। পত্নী বড় প্রবলা। দুঃখীরাম উভয়কে বাঘের ন্যায় ভয় করে।

বাড়ীর পার্শ্বে একটি ছোট নদী রূপার হারের ন্যায় পড়িয়া আছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুঃখীরাম তাহারই তীরে একটু সবুজ ঘাসের বিছানার উপর বসিয়া মৌতাত করে। আজও সে সেইখানে আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সম্মার্জ্জনী হস্তে অর্দ্ধাঙ্গিনী আসিয়া বলিল—মিন্‌সে, চিরদিনই কি এই রকম নিষ্কর্ম্মার ঢিবি হয়ে থাকিবে?

দুঃখীরাম ঈষৎ লজ্জায়, কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে, চাপা গলায় বলিল—দেখলে ত গিন্নি, জোলাপ কিছুতেই খুলল না! বৈদ্য হয়ে দেখলাম—রোগীকে ছুঁতে না ছুঁতে তার গোলোকদর্শন! সবাই কল্লে গাঁ ছাড়া! ঘোর তান্ত্রিক হ'লাম, গণনা আরম্ভ ক'রলাম—হয়ে গেল উল্টো শ্রী—সবাই করলে পাঁইতাড়া! মনের দুঃখে শেষে এই মৌতাত অভ্যাস ক'রলাম। আহা মৌতাত আমার সুয়োরাণী! ব'লব কি গিন্নী, তোমার সম্মার্জ্জনীর সম্বর্দ্ধনায় পৃষ্ঠদেশে যখন ধূমকেতুর উদয় হয়, তখন আমার মৌতাত-গিন্নী এসে দিব্য ঠাণ্ডা প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়! একেবারে বুঁদ!

ঠিক্ এই সময় ভজহরি আসিয়া দুঃখীরামের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে পদভরে মেদিনী কাঁপাইয়া গৃহিণী প্রস্থান করিল। দুঃখীরামের বড় কপাল জোর; নতুবা যে ভীষণ চামুণ্ডামূর্ত্তিতে অর্দ্ধাঙ্গিনী আবির্ভূতা হইয়াছিল এবং আশ্রিত দুঃখীরাম যেরূপ বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে সেদিন আর শুধু একটা ধূমকেতুতে ব্যাপারের পর্য্যবসান হইত না—অসাধ্য জহরবাতের ব্যবস্থা হইত!

ভজহরিকে দেখিয়া দুঃখীরাম বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল—কে বাবা তুমি, আমার খাসতালুকে বাঁশ গাড়্‌তে এসেছ?

ভজহরি অনেক দিনের পরিচিতের ন্যায় উত্তর করিল—কেও, দুঃখীরাম নাকি?

দুঃখীরাম তোড়জোড়টি একটু লুকাইয়া দুইপা পিছাইয়া বসিয়া বলিল—আজ্ঞে না।

ভজহরি। সে কি হে—জলজ্যান্ত সাড়া দিচ্ছ—আবার ব'লছো 'না'?

দুঃখীরাম। আজ্ঞে, সাড়া যিনি দিচ্ছেন তিনি দুঃখীবাম নন; রাম বনবাসে গিয়েছেন—এখন আছে শুধু দুঃখী!

ভজহরি। তা দিনরাত অত মৌতাত ক'ল্লে সুখী হবার ফুরসুৎ পাবে কেমন ক'রে দাদা?

দুঃখীরাম চটিল। সে মনে করিল আগন্তুক তাহার মৌতাতে

ভাগ বসাইতে আসিয়াছে। সে একটু ধরা গলায় উত্তর করিল—দেখতে পেয়েছ? তা স'রে পড় বাবা!

ভজহরি। বলি দুঃখীরান, কাজ্ আ'ছে।

দুঃখীরাম। আজ্ঞে না—দুঃখীরামের কাছে মৌতাত ছাড়া কাজ থাকতে পারে না। পথ দেখ বাবা, নইলে বল নিজেই স'রে পড়ি। দেখছ না একলারই কুলোচ্ছে না!

ভজহরি। আহা দুঃখীরাম, চট কেন?

দুঃখীরাম। না চটে আর কি করি? দেখছ না, মৌতাতের ওপর আর চাট জোটে না।

ভজহরি। যাতে চটপট চাট জোটে সেই ব্যবস্থাই তো ক'রতে এসেছি হে?

দুঃখীরাম। বাবা, ফাঁকা কথায় তো আর চিঁড়ে ভেজে না!

"বেশ বেশ, এই নমুনা লও" এই বলিয়া ভজহরি দুঃখীরামের হাতে দুটি টাকা দিল। দুঃখীরাম এপিট ওপিট করিয়া টাকা দুইটি পরীক্ষা করিয়া বলিল—বাবা, শেষটা ফাঁড়িদার ডাকবে না তো?

ভজহরি। কাজ আছে হে কর্ত্তা, নইলে চাঁদি কি আর অমনি বেরিয়েছে?

দুঃখীরামের আহ্লাদ হইল। সে ভজহরিকে কাছে বসাইয়া খাতির করিয়া বলিল—ব'সো সাঙ্গাৎ, তুমি বেশ লোক! এইবার বুঝলাম 'চোরে চোরে কুটুম্বিতে, আসা যাওয়া রেতে রেতে!'

ভজহরি। এখন কাজের কথাটা শোনো। বলি জাল টাল আসে ?

দুঃখীরাম। কেন আসবে না বাবা ? মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে কিনারায় বসে টানি ! কিন্তু বাবা, ধরি মাছ না ছুঁই পানি ! জলে নামতে পারবো না—নেশা চ'টে যাবে।

ভজহরি। আহা—সে জাল নয় ; বলি, হাতের লেখা কেমন ?

দুঃখীরাম। মুক্তো ! মুক্তো !

ভজহরি। অপরের লেখা দেখে ঠিক সেই রকম লিখতে পারো ?

দুঃখীরাম। বুঝেছি দাদা তুমি যা ব'লছো ! খুলে বলনা ভায়া—মাছধরা জাল নয়—আদালতি জাল !

ভজহরি। ঠিক ধ'রেছ দুঃখীরাম, তোমার বুদ্ধির তারিফ আছে। কাজ বিশেষ কিছু নয়, একখানি বন্ধকী খতে ভবেশ ঘোষালের নাম জাল ক'রে দিতে হবে।

দুঃখীরাম। তাতো বুঝলাম। কিন্তু বাবা, দুটী টাকায় তো তা হবে না। যেমনি পূজো তার তেমনি দক্ষিণে দরকার !

ভজহরি। তুমি কত চাও ?

দুঃখীরাম। পঞ্চাশের এক পয়সা কম নয়।

দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর ভজহরি পঞ্চাশ টাকা দিতেই স্বীকৃত হইল। তৎপরদিনই জাল খত প্রস্তুত হইয়া ভজহরির দলিলের বাক্সে গিয়া উঠিল।

৯

রমেশচন্দ্র জেলখানায়। তাহার মুক্তি পাইবার সময় সন্নিকট। দারুণ দুশ্চিন্তায়, ভয়ে ভাবনায়, লজ্জায় ঘৃণায়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে, অনিদ্রায় অনশনে তাহার বলিষ্ঠ দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—সোণার বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে—সুন্দর চক্ষু কোটরগত—কপালে শিরা উঠিয়াছে—মস্তকের কৃষ্ণ কেশরাশি অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় একেবারে শুভ্রবর্ণ! এতদিন যাহারা তাহার নিত্যসহচর ছিল তাহাদের মধ্যে কেহ দস্যু, কেহ জালিয়াৎ, কেহ দাঙ্গাবাজ, কেহ নরহত্যাকারী। যে নরকে এই সকল নরপশু অহোরাত্র তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে—নিরীহ নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণকুমার অদৃষ্টচক্রে আজ সেইখানে! দীর্ঘ তিন মাস কাল জয়ন্তীই রমেশচন্দ্রের জপমালা হইয়াছিল। ছেলেদের জন্য তাহার মন কাঁদিত, কিন্তু তত ভাবনা হইত না। সে জানিত—তাহাদের দেখিবার জয়ন্তী আছে, কিন্তু জয়ন্তীর কে আছে? সে ত স্বামী ছাড়া আর কিছু জানে না! স্বামী ধ্যান—স্বামী জ্ঞান—স্বামী তার শ্বাসের পবন। সে যে চাঁদে ধোয়া সরস্বতী—চন্দনমাখান বিল্বদল। এ দুর্দ্দিনে কে তার তত্ত্ব লয়! ভাবিতে ভাবিতে রমেশ আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হইয়া আইসে! সঙ্গী কয়েদীরা রমেশের

হাবভাব দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হয়—গা টেপাটিপি করে—অনেক সময় তাহার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসে। রমেশ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিত না। সঙ্গীরা তজ্জন্য রমেশের উপর চটা। জেল তাহাদের বৈঠকখানা—রমেশ তাহাদেরই একজন। তবে কেন সে দল-ছাড়া থাকিবে? সকলে পরামর্শ করিল—রমেশকে জব্দ কর!

একদিন ঘানিটানা শেষ করিয়া রমেশ অন্যমনে উঠানের এক কোণে বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতেছে—এমন সময় জেলের অধ্যক্ষ কয়েদীর কাজ দেখিতে আসেন। অপর কয়েদীরা তাঁহাকে জানাইল, রমেশ কাজ করে না—তাহার কাজ তাহাদেরই করিতে হয়। শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ তখনই রমেশকে বুটজুতার গুতা মারিয়া জাগাইলেন। রমেশ ভীতসন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবমীর পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। সাহেব রক্তচক্ষে জেলদারোগাকে ডাকিয়া রমেশকে দশ বেত মারিতে হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গী কয়েদীদের বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল!

বড় সাহেবের হুকুম তামিল করিতে জেলদারোগা বাধ্য; কিন্তু দারোগার বড় দয়ার শরীর—সে দুর্ব্বৃত্ত কয়েদীদিগের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছিল। রমেশকে সে বিশেষরূপ জানিত। আর অষ্টাহ কাল হইলেই সে এই নরক হইতে পরিত্রাণ পায়। বিনাদোষে এই সময়ে কেমন করিয়া সে তাহাকে দশ ঘা বেত লাগাইবে? সে রমেশকে ডাকিয়া বলিল—রমেশবাবু, সাহেব তোমাকে বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়াছে।

রমেশ দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিল—বেশ, মারুন্।

রমেশ তখন মনে মনে ভাবিতেছিল—জয়ন্তী কত জ্বালা সহ্য করিতেছে—আর আমি এই বেত্রাঘাতের জ্বালা সহ্য করিতে পারিব না!

দারোগা। তুমি কি কোনও দোষ ক'রেছ?

রমেশ। তা জানি না—হয়তো ক'রেছি।

দারোগার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। সে কারারক্ষককে ডাকিয়া মাত্র এক ঘা বেত মারিতে বলিয়া চলিয়া গেল। রমেশের জীর্ণ দেহে প্রহার সহ্য করিবার ক্ষমতা আদৌ ছিল না। এক ঘা বেত খাইয়াই রমেশ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে যখন তাহার চৈতন্য হইল তখন সে অনুভব করিল কে তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে। সে ভাবিতে লাগিল—মলয়পুরের সেই সুখের অট্টালিকা—জয়ন্তীর সেই প্রীতিভরা মুখ—তাহার সেই অক্লান্ত পরিচর্য্যা! স্নেহবিজড়িতকণ্ঠে রমেশ ডাকিল—জয়ন্তী, এখনো ঘুমাও নাই!

স্নেহার্দ্রস্বরে দারোগা বাবু রমেশকে ডাকিল। রমেশ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—একি! আমি কোথায়? আপনি কে?

দারোগা বাবু রমেশকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—স্থির হও ভাই—তুমি জেলখানায়!

তখনও রমেশ আবেগময়। সে পুনরায় বলিল—আমার জয়ন্তীকে তোমরা কোথায় রেখে এলে?

দারোগা। জয়ন্তী কে ?

রমেশ। জয়ন্তী আমার পত্নী—আমার সর্ব্বস্ব !

রমেশের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। বেত্রাঘাতের জন্য তাহার পিঠ আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দারোগা বাবু ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। অন্ধকারে কেহ দেখে নাই—কিন্তু আমরা জানি রমেশের জন্য হৃদয়বান্ জেলদারোগার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতেছিল।

১০

তিনমাস পূর্ণ হইলে একদিন দ্বিপ্রহরে দারোগাবাবু আসিয়া রমেশচন্দ্রকে জেলখানা হইতে ছাড়িয়া দিল। যে জীর্ণ বস্ত্রখানি পরিয়া রমেশ আসিয়াছিল, সেইখানি পরিয়াই সে দারোগাবাবুর কাছে বিদায় লইল। অপর কয়েদীরা হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। একজন রমেশকে বলিল—কি কর্ত্তা, ফের আসছ কবে?

রমেশ কোনও উত্তর না দিয়া প্রশ্নকারীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

দারোগাবাবু রমেশের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার হাতে দুইটী টাকা দিল। রমেশ লইতে চাহিল না। শেষে যখন দারোগা কাতরভাবে রমেশকে বলিল—"ভাই, আমি তোমায় দিই নাই, ছেলেদের জন্য কিছু মিষ্টান্ন লইয়া যাইও," তখন রমেশ টাকা দুইটি গ্রহণ করিল। যতক্ষণ না রমেশ দৃষ্টির অগোচর হইল, ততক্ষণ দারোগাবাবু ছলছলনেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। শেষে, কি জানি কেন, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

জেলখানার দীর্ঘ প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া রমেশ দেখিল, বিশ্বের নিয়মের কোথায়ও কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। মাথার উপর মধ্যাহ্ন-রবি

কিরণ বর্ষণ করিতেছে—পথের দুইধারে সেই পরিচিত বৃক্ষ-শ্রেণী—দূরে আম্রকাননে ঘুঘু ডাকিতেছে—পুকুরে শালুক ফুটিয়াছে—জলে ডাহুক সাঁতার দিতেছে—বালকের দল পূর্ব্বের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে · পাঁচনবাড়ি হাতে লইয়া রাখাল-বালকগণ গো-পালের সঙ্গে ছুটিতেছে—কৃষকগণ তেমনি আনন্দে মেঠোসুরে গান করিতেছে! কিয়দ্দূর গিয়া রমেশ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। সূর্য্যের কিরণ ম্লান হইল। রমেশ উঠিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের পথ ধরিয়া চলিল। যে রমেশচন্দ্র আজ তিনমাস ধরিয়া কবে জয়ন্তীকে দেখিতে পাইবে বলিয়া দিন গণিতেছিল—জয়ন্তীর চিন্তা যাহার জেলখানার যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিয়াছিল—জয়ন্তীর জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া যাহার অসুর-দেহ পাত হইয়া গিয়াছে—সেই জয়ন্তীর কাছে সে চলিয়াছে, তথাপি তাহার উৎসাহ নাই—আনন্দ নাই—স্ফূর্ত্তি নাই! কি এক অব্যক্ত বেদনা তাহার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। হয়ত সে ভাবিতেছে—কোথায় যাইতেছি—কি দেখিতে যাইতেছি! ঘরে অন্ন নাই—বস্ত্র নাই—ছেলেরা ক্ষুধার জ্বালায় ছুটাছুটি করিতেছে—জয়ন্তী হয়ত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়াছে! আমি তাদের গলগ্রহ হইব মাত্র। জেল-খাটা আসামীকে কেহ কর্ম্ম দিবে না বিশ্বাস করিবে না—গ্রামের লোক ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে!

একটী সন্দেশের দোকানের সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ রমেশের

দারোগাবাবুর টাকা দুটির কথা মনে পড়িল। দারোগা বাবু তাহার ছেলে দুটিকে খাইতে দিয়াছে। রমেশ ভাবিল—সন্দেশ কিনিয়া লই—আহা বাছারা খাইয়া বাঁচিবে! মিষ্টান্ন লইয়া রমেশ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ণিমার রাত্রি—সম্মুখে শান্ত সুন্দর ভাগীরথী সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মাখিয়া নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের ছবিখানি বুকে করিয়া সুমন্দ কল্লোলে ছুটিয়াছে। তীরে অনেক মহাজনের নৌকা বাঁধা আছে, মাঝিরা গান-গল্প করিতেছে। ছৈ-ওয়ালা বড় নৌকার ছাদে বসিয়া একজন মাঝি গাহিল—

"দশের ভারে ভরা নায় মা, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে মা তারা!"

গান শুনিয়া রমেশের চক্ষে জল আসিল। সে গঙ্গাতীরে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। জনবিরল পল্লীপথে কেহ তাহার সে কান্না দেখিতে পাইল না। গান থামিল—ধরণী নিস্তব্ধ হইল। গাছের মাথায় পাতায় পাতায় অসংখ্য জোনাকী জ্বলিতে লাগিল।

মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে—দুই চারিটা নিশাচর পক্ষী চাঁদের লোভে উর্দ্ধে—আরো উর্দ্ধে—উঠিয়া যাইতেছে। গাছের ডালে পাতার আড়ে বসিয়া কোকিল পঞ্চমে গাহিতেছে—ভৃঙ্গরাজ কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতেছে! সুন্দর রাত্রি—সুন্দর জ্যোৎস্না—সুন্দর ধরণী—পশুপক্ষী, তৃণলতা সব সুন্দর—সবার মুখে হাসি—সবাই আনন্দে মাতোয়ারা! শুধু হাসি নাই—আনন্দ নাই—রমেশচন্দ্রের!

রমেশ ভাবিল—এ বিরাট্ সৌন্দর্য্যময় বিশ্বে তাহার স্থান নাই! সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল—এক প্রহর রাত্রে স্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে লোক নাই—অদূরে তাহাদের গৃহ দেখা যাইতেছে। রমেশের বুক কাঁপিতে লাগিল। সব যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। কত চিন্তা—শৈশব হইতে আজি পর্য্যন্ত কত দিনের কত কথা—তাহার মনে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে কথা নাই—চক্ষে পলক নাই—অতিরিক্ত সুরা সেবন করিলে শরীর যেমন টলমল করে, রমেশ তেমনি টলিতেছিল! ভিতরের ঘর হইতে একটী ছোট ছেলে আধ আধ স্বরে বলিয়া উঠিল "মা, কে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে?" রমেশের চমক হইল; প্রাণসম পুত্রের সুললিত, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কণ্ঠধ্বনি স্নেহময় পিতার কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিল; রমেশ চীৎকার করিয়া বলিল "কৈ বাবারা—কাছে এসো! জয়ন্তী!" রমেশ রুদ্ধশ্বাস রোগীর ন্যায় উঠানে বসিয়া পড়িল; জয়ন্তী আসিয়া স্বামীর পাদমূলে মূর্চ্ছিতা হইলেন। ছেলে দুইটী কাঁদিতে লাগিল।

———

১১ .

শীতকাল। হিমালয় প্রদেশে শীতের পরিমাণ নাই। উপরে হিম —নীচে হিম—হিমানীর হিমশয্যা—হিমদেহ—হিমপ্রাণ—হিমআত্মা! সে হিমে মানুষ জমাট হইয়া যায়—জল জমাট হইয়া যায়—পৃথিবী জমাট হইয়া যায়! সম্মুখে পশ্চাতে, দূরে অদূরে, শিখরের পর শিখর যোজন ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষ নাই—লতা নাই শুধু অনন্ত তুষার রাশি! মাতা বসুমতীর অঙ্গ কে যেন শুভ্রবসনে ঢাকিয়া দিয়াছে! হিমগিরির শীতল করস্পর্শে অপরাহ্ন রবি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে রজতধবল তুষারকিরীটিনী বহিয়া পূত-প্রবাহিনী গোমুখী, গঙ্গা এবং মন্দাকিনী রূপে কঠিন বরফরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বিশ্বনাথের নাম গান করিতে করিতে মন্থর গতিতে চলিয়াছে। প্রবাহিণীর আর সে প্রাবৃটের নৃত্য নাই—উৎস সকল নিরুদ্ধ— সমীরণ তুষার-রাশি ছড়াইয়া দিতেছে। মনে হয় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বুঝি হিমপিণ্ডে পরিণত! সব শূন্য—শুধু কন্ কন্ কন্!

ক্রমে রাত্রি হইল। আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা; কিন্তু অন্ধকারের সে ঘন-ঘটা নাই। গগনস্পর্শী পর্ব্বতের হিমময় প্রদেশ-সমূহ অন্ধকার রাত্রিতেও নক্ষত্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহা

চন্দ্রালোক বলিয়া ভ্রম হয়। হিমালয়ের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় বদরি-নারায়ণের মন্দির দেখা যাইতেছে। সীমাশূন্য সুন্দর সুনীল আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটন্ত ফুলের মত ঝলমল করিতেছে। আর সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সুমধুর আলোকরশ্মি শৈলে শৈলে, শিখরে শিখরে, নির্ঝরিণীর ধারায় ধারায়, অলকানন্দার লহরে লহরে, সমগ্র গিরিরাজের প্রতি অঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকটিত করিতেছে। উপরে আকাশ ভরা ফুল, নীচে দর্পণবিনিন্দিত তুষারাবৃত হিমাচলে তাহার প্রতিচ্ছবি! উপরে ফুল—নীচে ফুল—উপরে আকাশ নীচে আকাশ—স্বর্গমর্ত্ত্যের শোভাময় সম্মিলন। এখানে পাপের কলুষ নাই—লোকালয়ের কোলাহল নাই—পীড়িতের আর্ত্তনাদ নাই। সব নির্ম্মল—শীতল—শান্তরসাস্পদ। তাই এই স্বর্গরাজ্যে অন্ধকারের মধ্যে আলোকের খেলা—ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল!

এই সুমহান দৃশ্যের মধ্যে, মহানিশার মহান্ধকারে অলকানন্দার তটসন্নবর্ত্তী মন্দিরাভ্যন্তরে বদরিনারায়ণের পূজা হইতেছে। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, সহস্রকণ্ঠে সমস্বরে "জয় বদরি বিশালাক্ষী জয়" ধ্বনি সমগ্র হিমালয়কে মাতাইয়া তুলিয়াছে। কত সাধুসন্ন্যাসী, ভিক্ষুদণ্ডী, পরিব্রাজক সেই অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতি অনিমিষে চাহিয়া আছেন। দ্রাবিড়, কঙ্কন, দাক্ষিণাত্য, পুরুষোত্তম, অঙ্গ বঙ্গ-ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে কত শত ভক্ত ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তিকল্পে বন্ধুর

পথ অতিক্রম করিয়া আজ এই মহাতীর্থে সমবেত! কত গলিত-অঙ্গ, পলিতকেশ বৃদ্ধ বা বর্ষিয়সী শীতাতপের সকল কষ্ট সহ্য করিয়া এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অবাধে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। ধন্য ভারত-বাসীর ধর্ম্ম-পিপাসা—ধন্য এই পুণ্যভূমির সন্তানবৃন্দ!

দীপান্বিতা অমাবস্যায় বদরিনারায়ণের শেষ পূজা হইয়া থাকে। তাহার পর ছয় মাস কাল মন্দির তুষারমধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। বৈশাখ মাসে বরফরাশি গলিয়া গেলে আবার দ্বার উন্মোচন করা হয়। আজ পূজার বড় আড়ম্বর। বৃহৎ দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে—ছয় মাসের উপযোগী ভোগাদির দ্রব্যসম্ভারে দেবতার স্থান পরিপূর্ণ। পূজা সম্পন্ন হইল—ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সকলে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে লাগিলেন। বিগ্রহের বড় মধুর বেশ—বড় শান্ত মূর্ত্তি! ছয় মাসের জন্য দেবতার সমাধি হইবে—তাই আজ দেবাদিদেব যেন ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন।

মধ্যরাত্রে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইল। যাত্রীগণ সকলেই বাহিরের চটিতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন; কল্য প্রভাতে পাহাড় হইতে অবতরণ করিবেন। দুইজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী চটির এক প্রান্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। মন্দির হইতে আসিয়াই একজন শয়ন করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ ভাই"? পীড়িত ব্যক্তি উত্তর করিলেন—শরীর যেমনই থাক, দেবদর্শনে জীবন সার্থক হইয়াছে। আহা

কি দেখিলাম—জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না! চাটুয্যে মশাই, তুমি ভাই বিশ্রাম কর।

সঙ্গী বলিলেন—আমার বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নাই—আমি বেশ আছি। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় তোমার বুকে পিঠে বেদনা—এখন দেখিতেছি জ্বরও হইয়াছে। কাল কি যাইতে পারিবে?

"না পারি জন্মের মত এই পরম স্থানে বিশ্রাম করিব—সে জন্ম ভাবনা কি ভাই?" বলিয়া পীড়িত ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন পীড়িত ব্যক্তি আমাদের ভবেশচন্দ্র ঘোষাল। তাঁহার সঙ্গীর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ পরিচয় নাই। তাঁহার নাম হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মলয়পুরে সবাই তাঁহাকে 'চাটুয্যে মশাই' বলিয়া ডাকে। তিনি ধার্ম্মিক ও পরোপকারী—ভবেশের বাল্যবন্ধু। ভবেশ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। ভদ্রাসন বাটী বন্ধক দিয়া তাঁহারই কাছে পাঁচশত টাকা লইয়া ভবেশ তীর্থ যাত্রা করেন। পথে তাঁহার অনেকগুলি টাকা চুরী যায়। এখন তিনি কপর্দ্দকশূন্য। বন্ধু হারাণচন্দ্রের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার দিন চলিতেছে। বদরিনাথে আসা অবধি ভবেশের শরীর ভাল নাই। একজন পাণ্ডা দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহার নাড়ী দেখিয়া বলিয়াছিল—"বাবু, সাবধান, আপনার শরীর শ্লেষ্মায় পূর্ণ

হইয়াছে—হঠাৎ নিউমোনিয়া হইলেই মহা বিপদ্।" ভবেশ সে কথা গ্রাহ্যও করেন নাই। বদরিনারায়ণ দর্শন তাঁহার আশৈশবের সাধ; সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে—ব্যাধি বা মৃত্যুকে আর তিনি ভয় করেন না।

১২

অতি প্রত্যুষে ব্রজবাসী বৈরাগিগণের মধুর ভজন শুনিতে শুনিতে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। করতাল বাজাইয়া একজন গাহিলেন :—

ভোর ভই যশমতি বোলায়ে উঠত নন্দলালা জী।
উঠতে লালা, নন্দদুলালা, মোহনবেশ বানাওয়ে জী॥
কোই কোই উঠত, কোই মুখ পুঁছত,
কোই অরুণ পানে চাওয়ে জী।
কোই কোই ব্রজনারী, কাঁকে কুম্ভ করি,
কোই যমুনা চলি যাওয়ে জী॥
হে ব্রজবাসী, গোকুল নিবাসী,
জাগাওয়ে নন্দ কানাইয়া জী।
প্রাতঃ সময় কালে, কোকিল বোলত ডালে,
খঞ্জন আঙ্গিনা ব্রাওয়ে জী॥
হে নারায়ণ, হে মধুসূদন, হে গোবর্দ্ধন ধারী জী।
ত্বং সদানন্দ, সদ্‌গুণধারী, সাক্ষী ভৃগুপদ চিহ্ন জী॥
জয় যদুনন্দন, জগত জীবন, ত্বং হি অটল বিহারী জী।

ধেনু চরাওয়ে, বেণু বাজায়ে, সাথে লিয়ে ব্রজবালাজী।
কুঞ্জে কুঞ্জে শব্দ ফুকারে রাধে রাধে কৃষ্ণ জী!

খঞ্জনী বাজাইয়া আর একদল গাহিলেন :—

সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরায়ী।
ভজরে গোবিন্দনাম আওর কোই নাই॥
রসনা রস নাম লেত, সন্তনকো দরশ দেত
ঈষৎ মুখ চন্দ বিন্দ, সুন্দর সুখদায়ী।
কেশর কো তিলক ভাল, মানোরবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণে কুণ্ডল ঝিলমিলাতি, রবি পথ ছব ছায়ী॥
মোতিয়ন কি কণ্ঠমাল, তারাগণ অতি বিশাল,
মানোগিরি শিখর ফোড়, সুর সর চলি আয়ী।
সখা সহিত সরযূতীর, বিহরত রঘুবংশবীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস, চরণন্ রজপায়ী॥

প্রভাত হইল। তুষার রাশির মধ্য হইতে পরমানন্দে অলকানন্দা নাচিয়া উঠিল—সহসা কে যেন শিখরে শিখরে গলিত সুবর্ণরাশি ছড়াইয়া দিল। জড় জগতের চেতনা ফিরিয়া আসিল। কি অভিনব সূর্য্যোদয়! এ শুধু পূর্ব্বাকাশ লোহিতরাগরঞ্জিত নহে, এ শুধু একখানি সোণার থালা আকাশের কোলে পড়িয়া নাই—এক সূর্য্য লক্ষ হইয়া লক্ষ তুষারশিখরের উপর ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে! আবার সেই রবি শৈলসুতাসমূহের প্রতি তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে।

বদরিকার ক্ষুদ্র উপত্যকা হইতে যেদিকে দেখ সেইদিকেই দিবাকর দিব্যকরে দিঙ্‌মণ্ডল প্লাবিত করিতেছে! অনন্ত আকাশ—তাহারই মাঝে অনন্ত রবির বিকাশ, দিক্‌বিদিক্ কিছুই বুঝা যায় না! সকলই আনন্দময়ের অনন্ত সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি! নিকটে—দূরে গিরীনদী-সমূহের স্ফটিকতুল্য বারিরাশি নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে। প্রতিপদে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড তাহাদের বাধা দিতেছে। কিন্তু চঞ্চলা ঊর্ম্মিমালা স্বকীয় তারল্যে কঠিন শিলাগাত্রে সিঞ্চিত করিয়া সহর্ষে প্রধাবিতা। কল কল ধ্বনি করিয়া তাহারা যেন বলিতেছে—কঠোরতা নিষ্ঠুরতা কি স্নেহ দয়ার কোমল প্রভাব রুদ্ধ করিতে পারে? শত নির্ঝরিণী স্রোতস্বিনীর অঙ্গপুষ্টিসাধনে অবিরাম ধাবিত। উচ্চ হইতে কত উৎফুল্ল হইয়াই তাহারা নামিতেছে। তাহাদের উল্লাসগীতি শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে ধ্বনিত হইয়া যেন প্রকৃতির মহোল্লাস জ্ঞাপন করিতেছে!

ভজন গাহিতে গাহিতে বৈরাগীর দল প্রস্থান করিলেন। যাত্রিগণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধানপূর্ব্বক অলকানন্দায় স্নান করিয়া চরিতার্থ হইলেন।

"জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং—"

বলিয়া সাধুগণ সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলেন। পরে সকলে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। "বদরি নারায়ণ

কী জয়”—“বদরি বিশালাকী জয়” ইত্যাদি রবে ক্ষুদ্র উপত্যকা ধ্বনিত হইতে লাগিল। দুইজন যাত্রী চটিতে পড়িয়া রহিলেন। ভবেশচন্দ্রের প্রবল জ্বর—নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তিনি প্রলাপ বকিতেছেন; চাটুয্যে মহাশয় দুইএকটি পাণ্ডার সাহায্যে তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত। রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন —অল্পসময়ের মধ্যে রোগ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, হিমালয়ের সেই নিভৃত কন্দরে পড়িয়া ভবেশচন্দ্রের জীবনের রশ্মি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ভবেশচন্দ্রের একবার চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। একবার মলয়পুরের কথা মনে হইল। রমেশচন্দ্র অসমর্থ, ভ্রাতৃষ্পুত্র দুইটি নিতান্ত শিশু, তাহাদের দিনপাতের কিছুই নাই। ভবেশচন্দ্র চাটুয্যে মহাশয়কে বলিলেন—দাদা, সংসারের ভাবনা কখনও ভাবি নাই। যাঁর ভাবনায় বিভোর ছিলাম, তাঁরই দয়ায় আজ তাঁর কাছে দেহ রক্ষা করিতে আসিয়াছি। তোমার কাছে একটু অনুরোধ আছে। আমার মলয়পুরের ভিটাটুকু তোমার কাছে বন্ধক। রমেশ যেন থাকিতে পায়।

হারাণচন্দ্র বলিলেন—ওকি কথা ভাই, সে বন্ধকী দলিল আমি গিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিব।

ভবেশচন্দ্র স্থির হইলেন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইতে তিনি অঘোর অচৈতন্য। অস্ফুটস্বরে ক্ষণে ক্ষণে

দুইচারিবার শ্রীভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। শেষরাত্রে সব ফুরাইয়া গেল। যোগীজন-বাঞ্ছিত সেই পরমস্থানে পুণ্যাত্মার নশ্বরদেহের ভস্মাবশেষ পড়িয়া রহিল।

১৩

রমেশের দিন অচল। গ্রামের লোক সাহায্য করিবার ভয়ে কেহ আর উঁকী মারিয়াও তাহার খবর লইল না। বহুদিন ভবেশচন্দ্রেরও কোন সংবাদ নাই। রমেশ ও জয়ন্তীর ভয় হইতে লাগিল। এদিকে সংসারের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তদপেক্ষা শোচনীয় আর কিছু হইতে পারে বলিয়া রমেশের ধারণা ছিল না। সে এখন বুঝিতে পারিল তাহার ধারণা ভুল—কপালে এখনও অনেক কষ্ট আছে। রমেশ ভাবিল, দূর গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিলে হয় না? পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—"ছি, ছি, ভিক্ষা! দাদা ফিরিয়া আসিয়া কি বলিবেন! তার চেয়ে উপবাস ভাল—মৃত্যুও শ্রেয়ঃ! তা ছাড়া ভদ্রবংশীয় বলিষ্ঠ পুরুষকে কে দয়া করিয়া ভিক্ষা দিবে?" নানারূপ চিন্তা করিয়া রমেশ ভিক্ষার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। কর্ম্ম নাই—ভিক্ষা নীচকার্য্য—তবে দিন চলিবে কেমন করিয়া? রমেশ একবার মনে করিল, জেলখানায় জালিয়াৎ চোর ডাকাত কত রহিয়াছে—তাহারা ত দিব্য সুখে আছে! হয় ত তাহারা পেটের জ্বালায় ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। স্ত্রী-পুত্রকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অপেক্ষা কি চৌর্য্যাদি বাঞ্ছনীয় নয়? রমেশ আর ভাবিতে পারিল না—সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে বড়

আশা ছিল দাদা আসিবেন—তাঁহার পাদস্পর্শে মলয়পুরের ঘোষাল পরিবারের দুঃখ কষ্ট মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত উড়িয়া যাইবে। কিন্তু কৈ—ভবেশ ত ফিরিলেন না!

রমেশের বড় ছেলেটী শয্যাশায়ী হইয়াছে। রোগ জ্বরাতিসার—শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। পান্তা ভাত, বাসি ব্যঞ্জন, উপবাস ইত্যাদি রোগের কারণ। রমেশ একদিন ছেলেকে কোলে করিয়া গ্রামস্থ বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইল। বৈদ্য বলিলেন—"আহার বিষয়ে সাবধান বাপু—রোগ কঠিন।" রমেশের মনে হইল বৈদ্য বুঝি তাহাকে বিদ্রূপ কবিলেন। সে বলিয়া উঠিল—"আহার কোথায় যে সাবধান হইব? পথ্য নাই—পয়সা নাই—খেতে না দিয়া শুধু ঔষধে আরাম করিতে পারেন?" বৈদ্য রমেশের মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। রমেশ ছেলে লইয়া চলিয়া গেল। বাড়ী আসিয়া জয়ন্তীকে বলিল—জয়ন্তী, বুক বাঁধ; কঠিন রোগ—ভাল ভাল পথ্য চাই—এ দিকে দিন অচল! বিধির কেমন বিচার বল দেখি?

জয়ন্তীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছোট ছেলেটী খাবার চাহিল। রমেশ তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল। জীবনে রমেশ প্রাণাধিক পুত্রদের কখন জোরে কথা কয় নাই; কখন তাহাদের বুক হইতে নামায় নাই। ছেলেরাও বাপ বলিতে অজ্ঞান; দূরে পায়ের শব্দ পাইলে তাহারা—"ঐ বাবা আস্‌ছে"—"আমার বাবা আস্‌ছে"—বলিতে বলিতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিত। আজ পিতার তিরস্কার

সুকুমারের প্রাণে বড় বাজিল—সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রমেশ আর সে দিকে চাহিল না; জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঘরে কিছু আছে কি?" জয়ন্তী কি উত্তর দিবেন—নতমুখে মাটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

ঠিক্ এমনি সময়ে বহির্দ্বারে শব্দ হইল। পরক্ষণেই একজন টেলিগ্রাফের পেয়াদা প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—'বাবু, টেলিগ্রাফ'! টেলিগ্রাফ হস্তে, পাগড়ী মাথায়, চাপরাশ-আঁটা, কোম্পানীর পেয়াদার আগমনে গ্রামে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ছেলের দল লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে—বুড়াবুড়ী গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—স্নানের ঘাটে দাঁড়াইয়া গ্রাম্য বধূগণ হাঁ করিয়া পেয়াদা দেখিতেছে। পেয়াদা মহাশয়ও গ্রামবাসীদের এই বিপুল সম্বর্দ্ধনায় গর্ব্বিতভাবে গ্রীবা উচ্চ করিয়া, গোঁফে তা দিতে দিতে, সজোরে পা ঠুকিয়া ছিন্ন নাগরাজুতার নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিতে করিতে বীরপুরুষের মত যাইতেছিল! সে যখন ঘোষালগৃহে প্রবেশ করিল তখন তাহার সঙ্গে প্রায় আধখানি গ্রাম সেইখানে সমবেত হইয়াছে। টেলিগ্রাফ আসায় এরূপ হইবার কারণ এই যে, তখনকার কালে তারের খবর যাওয়া-আসাটা ইদানীন্তনের ন্যায় প্রচলিত হয় নাই। একটা কোন ভয়ঙ্কর আপদ্ বিপদ্ না ঘটিলে আর টেলিগ্রাফ আসিত না।

খবর জানিবার জন্য ঘোষালবাড়ীর সম্মুখে সেই বিপুল জনতা ঔৎসুক্যসহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। টেলিগ্রাফখানি —

করিয়া রমেশের হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহার চোখমুখ নিমেষে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল—পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। পেয়াদা রমেশের অবস্থা বুঝিয়া একটী পেন্‌সিল ও এক টুক্‌রা কাগজ তাহার হাতে দিয়া বলিল—"বাবু এই কাগজে সই করিয়া দিন,আমি যাই।" রমেশ সই দিয়া পেয়াদাকে বিদায় করিল। এই-বার টেলিগ্রাফ খুলিতে হইবে। কি করিয়া খুলে! খুলিয়া কি দেখিবে! প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া কম্পিতকলেবর রমেশচন্দ্র খাম খুলিয়া পড়িলেন :—"Bhabesh died of Pneumonia at Badrinath"—বদ্‌রিনাথে নিউমোনিয়ার ভবেশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে! সকলে শুনিল। অনেকেই হা হুতাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"একটা ইন্দ্রপাত হইল"—কেহ শুধু "হায়হায়" করিতে লাগিল; দুই এক জন বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল—"পুণ্যের শরীর—পুণ্যধামে রহিল—দেবতার ধন দেবতাই লইলেন!" একজন পতিপুত্রহীনা অনাথিনী বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল—"হায় রে রমেশ—তোর কপালে এত দুঃখও বিধাতা লিখেছিল!" সকলকার সকল উক্তি ছাপাইয়া, জনতা ভেদ করিয়া কে বলিয়া উঠিল—"কালী—কাল-ভয় হারিণি! ত্রিনয়নি! তুমি ধন্যা!" আগন্তুকগণ অবাক্ হইয়া দেখিল, বক্তা ভজহরি ঠাকুর!

১৪

এতদিনে রমেশ সর্ব্বস্বান্ত হইল। দাদা আর ইহলোকে নাই—রমেশের বুকখানা শূন্য হইয়া গিয়াছে—বক্ষঃস্থল হইতে পঞ্জরগুলি কে যেন ছিঁড়িয়া লইয়াছে; কিন্তু তাহার চক্ষে জল নাই! সে বহুক্ষণ প্রাঙ্গণে বসিয়া রহিল—রোরুদ্যমানা জয়ন্তী, শিশু সুকুমার তাহার কাছে আসিল—রমেশ তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার সেই বিষাদ-কালিমা-লিপ্ত মুখের প্রতি চাহিয়া জয়ন্তীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। শেষ তিনি অতি কাতরভাবে বলিলেন—তুমি যদি অমন কাতর হইয়া পড়, আমি তাহলে বাছাদের নিয়ে দাঁড়াই কোথায়?

রমেশ মাথা তুলিয়া একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিল। পরক্ষণেই বলিল—আর দাঁড়াবার ভাবনা কি জয়ন্তী! দেবতার আশ্রয়ে ছিলাম; সেই দেবতা যখন ত্যাগ করিয়াছেন তখন আর ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানঅপমান, সুস্থানকুস্থান বিচার করিবার কিছু নাই। নির্ভয়ে দাঁড়াও—আর ভয় নাই—ভাবনা নাই। বেশ একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

বিন্দুর মা বলিয়া পাড়ার একজন বাগ্দী বুড়ী জয়ন্তীকে বড় ভালবাসিত এবং সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে আসিয়া সুখদুঃখের কথা কহিত।

রমেশ যখন জয়ন্তীর সহিত কথা কহিতেছিল তখন সে অন্দরে ছিল ; হঠাৎ ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া রমেশকে বলিল—হাঁ গা ছোটবাবু, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছো যে ? এ দিকে ক্ষুধার জ্বালায় বড় খোকা যে ভোচ্‌কানি লেগে যায় ! আহা, ডাকলে সাড়া দেয় বাছার এমন শক্তিটুকু নাই ! শীগ্‌গীর যাও—দুধ এনে দাও ! চুপ করে বসে থাকবার কি এই সময় ছোটবাবু ? পয়সার চেষ্টা না করলে কি পয়সা হয় ? দেখ্‌ছ না বাবু পয়সার জন্য আজ কি কষ্ট !

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। বেশ সুস্থ, সবল ; চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে ! সে বিন্দুর মাকে বলিল—বিন্দুর মা, ঠিক বলেছিস্—চেষ্টা না করলে কি পয়সা হয় ! দেবতার ভোগ দুর্লভ সামগ্রী—তাই চেষ্টা করেও পাই নি—এখন আর ভয় নেই ! পয়সা পথে ছড়ান আছে বিন্দুর মা যাব আর আন্‌ব !

রমেশ বেগে প্রস্থান করিল। জয়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর মার সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

১৫

ভবেশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে বজ্রাহত হইয়া রমেশ যখন বসিয়া পড়িল—ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় হতভাগিনী জয়ন্তী যখন ভূলুণ্ঠিতা হইলেন—অনাহারক্লিষ্ট অস্থিচর্ম্মসার সন্তানের শীর্ণ তনুখানির উপর যখন মৃত্যুর ম্লান ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল—অনন্যগতি মাতাপিতা যখন সন্তানকে শেষ বিদায় দিবার পূর্ব্বে তাহার শুষ্ক মুখে এতটুকু আহার দিতে পারিল না—সেইসময় রমেশচন্দ্রের এক অবস্থাপন্ন প্রতিবেশীর গৃহে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মহোৎসব চলিতেছিল। নহবতের বাদ্য বাজিতেছে; কত হাসি—কত আনন্দ! চতুর্দ্দিকে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ধ্বনি! বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য! কত অপচয় হইতেছে। বাড়ীর সম্মুখে পথের ধারে কত উচ্ছিষ্ট খাদ্য ও পত্রাদি পড়িয়া আছে! বৈপরীত্যের কি বিভীষিকাময় দৃশ্য! কোথায় মহাকালের শীতল করস্পর্শ আর কোথায় চির-আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের জন্মোৎসব! কোথায় মৃত্যুর হাহাকার আর কোথায় উৎসবের উল্লাসধ্বনি! কোথায় পুত্র-শোকাতুরা নারীর শোকোদ্বেলিত কণ্ঠের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ আর কোথায় স্ফুরিতাধরা ভাগ্যবতীর পুত্রহিতার্থ মহোৎসবের আয়োজন! কোথায় শোক-তাপ-দুঃখ-দৈন্যের নিদারুণ নিষ্পেষণ আর কোথায়

কমলার কৃপাবলে ঐশ্বর্য্যসাগরে নিমজ্জন! বিশ্বের যেদিকে চাও সেই দিকেই এইরূপ অভিনব চিত্র পরিদৃশ্যমান। চেতন ছাড়িয়া একবার জড়জগতের প্রতি চাহিয়া দেখ; ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর; সেখানেও সেই দৃশ্যের পুনরভিনয় চলিতেছে। ঐ দেখ, আজ যেখানে উচ্চ গিরিশিখর মস্তক সমুন্নত করিয়া দণ্ডায়মান, কাল সেখানে সীমাশূন্য বিশাল বারিধি ঘোর রোলে ফেন উদ্গীরণ করিতেছে! ঐ দেখ, অনন্ত অপার মহাসাগরের স্থানে ধনধান্যপূর্ণা বিরাট্ বসুন্ধরা বিরাজ করিতেছে! ঐ দেখ, একটা নক্ষত্রের সহিত আর একটা নক্ষত্রের সংঘর্ষের ফলে কত শত উল্কাপাত হইতেছে! একটা সৌর-জগতের উপর আর একটা সৌরজগৎ ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! প্রলয়-পয়োধিজলে একটা পৃথিবী ডুবিতেছে—আর একটা পৃথিবী উঠিতেছে! বিধাতার এ ইন্দ্রজাল, এ দুর্ভেদ্য রহস্য, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমরা কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব?

ক্ষুধার্ত্ত শিশু সুকুমার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই উচ্ছিষ্ট পত্রাদির নিকট আসিয়া একদৃষ্টে পরিত্যক্ত আহার্য্যের প্রতি দেখিতে লাগিল। কতক-গুলা কুকুর সেই খাবার খাইতেছিল। একটী অতি দুর্ব্বলা কুকুরী কিঞ্চিৎ আহার্য্যপ্রাপ্তির আশায় সেইখানে আসিল। সবল সারমেয়-গণ পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। ক্ষুধার্থ সুকুমার আহার্য্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না—কুকুরের দংশনভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া সে উচ্ছিষ্ট ভোজন আরম্ভ করিল। দুএকটা দুষ্ট কুকুর

এক একবার তাহাকে তাড়া করে—বালক দুই চারি পা সরিয়া যায়—আবার আসিয়া খাইতে থাকে। আহা, বাছার উদরে অগ্নি জ্বলিতেছে, আর কি সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে?

রমেশচন্দ্র বাহিরে আসিয়াই এই দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহার মস্তিষ্ক তখন মহাপ্রলয়গ্রস্ত। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বের রমেশচন্দ্রের সহিত এ রমেশের আর কোন সাদৃশ্য নাই। পুত্র কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছে দেখিয়া রমেশ হাসিতে লাগিল! পিতাকে দেখিয়া সুকুমার তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিতে গেল। রমেশ ছেলেকে কোলে লইল; পরক্ষণেই তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিল—যাও, পাত কুড়িয়ে খাওগে!

শিশু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল রমেশ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

১৬

মলয়পুরের দুই ক্রোশ দূরে রামগড়ের বৃহৎ দীর্ঘিকা। এতবড় দীঘি হুগলীজেলায় আর ছিল না। দীঘির এপার ওপার দেখা যাইত না। তালগাছবেষ্টিত বলিয়া উহা "তালদীঘি" নামে খ্যাত ছিল। 'তাল দীঘি' স্থানীয় জমিদার প্রাণকৃষ্ণবাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় কীর্ত্তি। পাঁচ সাতখানা গ্রামের লোক এই দীঘির জল খাইয়া বাঁচিত। বড় সুস্বাদ ও মিষ্ট জল। পূর্ব্বে বঙ্গের বহুস্থানেই এইরূপ বড় বড় দীর্ঘিকা দেখা যাইত। জলাশয় প্রতিষ্ঠা তখন অবস্থাপন্ন হিন্দুর একটা গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। দীঘির চারি পাড়ে দিব্য ছায়া। সারি সারি তালবৃক্ষ—কে যেন মাথার উপর তালপাতার সামিয়ানা খাটাইয়া দিয়াছে। তালগাছের উপর অনেকগুলি বাবুইপাখীর বাসা ঝুলিতেছে। পাড়ার কতকগুলা দুষ্ট ছেলে বাসা হইতে ছানা পাড়িবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দীঘির কাল জলে হাঁস সাঁতার কাটিতেছে। মাছরাঙ্গার দল উড়িতে উড়িতে ছোঁ মারিয়া জল হইতে তাহাদের শীকার তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। ভণ্ডতপস্বী ভজহরির ন্যায় কয়েকটী বক অর্দ্ধ-নীমিলিত-নেত্রে জলের ধারে বসিয়া আছে।

অদৃষ্টের পরিহাস

প্রশস্ত বাঁধাঘাটের চাতালের উপর ফরাসের বিছানা। জমিদার বাবু তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত এইখানে বসিয়া প্রত্যহ দুই বেলা প্রেমারা খেলিয়া থাকেন। ঘাটের দুই দিকে দুইটা কল্‌কে ফুলের গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া—তাহাদের মিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া দিতেছে। কুল-গাছের পাতার আড়ালে বসিয়া বুলবুলি ঝুঁটি নাড়িতেছে—দূরে গাছের কোটর হইতে থাকিয়া থাকিয়া 'কটর' 'কটর' করিয়া কাঠ-ঠোক্‌রা পাখী ডাকিতেছে।

সপারিষদ জমিদার বাবু আসিয়া চাতালের বিছানায় বসিলেন। ভৃত্য ফরসীতে তামাক দিয়া গেল। তাস পাশা প্রেমারা খেলা আরম্ভ হইল। জমিদার বাবু ১০৲ টাকা হারিলেন। খেলা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন ঘাটের ধারে অস্নাত অনাহারী রমেশচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রুক্ষ কেশ মলিন বেশ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া জমিদার বাবু বলিলেন—কেরে? এখানে কি চাস্?

রমেশ। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা!

জমিদার। সরে পড় বাবা—সরে পড়! আমাদের এখন কথা কইবার ফুর্স্‌ৎ নেই!

রমেশ। মহাশয়, জুয়া খেলিয়া কত পয়সা উড়াইতেছেন; তার চেয়ে আমায় দুপয়সা দিলে সপরিবারে বাঁচিয়া যাইতাম!

একজন পারিষদ বলিয়া উঠিল—এ বেল্লিক বেটা কে রে? বেটা আবার বিধান দেয়! আস্পর্দ্ধা দেখ!

দ্বিতীয় ব্যক্তি কটূক্তিপূর্ব্বক রমেশকে চলিয়া যাইতে বলিল। রমেশ বলিল—আমি অনন্যোপায়—আপনারা আমায় দয়া করুন!

জমিদার। দয়া কিসের রে শালা? সাতটা বাঘের খোরাক ঐ দেহ—ওঁকে আবার দয়া করতে হবে? খেটে খেগে না, ভিক্ষা চাইতে লজ্জা হচ্চে না?

রমেশ। লজ্জা সরম সব গেছে—আমার স্ত্রীপুত্র যায়। আজকার মত আমায় কিছু দিন!

'পয়সা বড় সস্তা পেয়েছ বটে বেটা পাঁটা'—বলিয়াই একজন রমেশকে এক চপেটাঘাত করিল। রমেশ একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আর কেহ তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইল না। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, লোকটা বদ্ধ পাগল—নতুবা গাল খাইয়া, মার খাইয়া হাসিবে কেন?

১৭.

পথের ধারে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের আড়ালে একখানি মুদীখানার দোকান। একে গাছের আড়াল— তাহাতে আবার, নববধূর অবগুণ্ঠনের মত, চালখানি দাওয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়ায় বাহির হইতে উহা মুদীখানা কিনা বুঝা সুকঠিন এবং খুব নীচু হইয়া না দেখিলে উহার সাজ-সজ্জা কিছুই দেখা যায় না। ছোট গাঁয়ের ছোট দোকান। ঘরের ভিতর কিছু কিছু চাল, ডাল, নুন, তেল এবং বাহিরের দাওয়ার এক অংশে কয়েকখানি ভাঙ্গা বারকোশে কিঞ্চিৎ জিলিপি, গজা, পান্তুয়া, সন্দেশ ইত্যাদি। চর্ম্মচক্ষে মিষ্টান্নগুলি দেখিবার উপায় নাই। অগণিত মক্ষিকা ও বোল্‌তা সর্ব্বদাই সেগুলিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখে। সর্ব্বপ্রথমে মোদক নন্দগোপের রচনা-কৌশল, পরে মক্ষিকাকুলের আক্রমণ—উভয়ের মধ্যে পড়িয়া মিষ্টান্নের যেরূপ রূপান্তর ঘটে তাহা ভোক্তা ভিন্ন অপর কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। আজকাল যেমন "রাজভোগ", "আবার খাবো" ইত্যাদি মিষ্টান্নের নূতন নূতন নাম হইয়াছে, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত নামকরণ করিতে হইলে নন্দগোপের রচিত মিষ্টান্নগুলি "বোলতাবিলাস জিলিপি," "পিলেফাটা মোণ্ডা," "দাঁতভাঙ্গা গজা,"

"গোবরগণেশ পাস্তয়া," ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করা যাইতে পারে।

কাঁধে গামছা, হাতে দাঁড়শুদ্ধ একটী চন্দনা পাখী—নন্দগোপ দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্নানে যাইবে—তৎপূর্ব্বে পাখীটাকে একবার পড়াইয়া লইতেছে। বুড়া পাখী—সম্প্রতি নন্দ ধরিয়াছে। তাহার আর লেখাপড়ার বয়স নাই। নন্দ তাহা বুঝে না। সে পাখীটার কাণের কাছে "পড় বাবা আত্মারাম" বলিয়া সর্ব্বদাই উৎকট চীৎকার করে। ভয় পাইয়া পাখীটা ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিতে থাকে। নন্দ আহ্লাদে আটখানা হইয়া যায়। সে ভাবে দিব্য পড়িতেছে! ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ = আত্মারাম; ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ = রাধা-শ্যাম; ক্যাঁক্-কাঁক্ = কৃষ্ণ রাধা! নন্দগোপের এইরূপ ব্যাখ্যা! পাখীকে পাইয়া সে ধন্য হইয়াছে।

পাখীটা শুধু যে নন্দকে ফাঁদে ফেলিয়াছে তাহা নহে তাহার মাও বার্দ্ধক্যের চরমসীমায় আসিয়া জীবন-খানিকে পাখীময় করিয়া তুলিয়াছে। বুনো পাখী - কেহ কাছে গেলেই পাখা ঝাড়া দিয়া চীৎকার করে—খোঁচা মারিলে ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করিতে করিতে শিকল শুদ্ধ ঝুলিতে থাকে—ভয়ে কামড়াইতেও পারে না। বৃদ্ধা বলে —"ও পাখী নয়—দেবদূত! দিন রাতই মধুর সুরে নাম বিতরণ করে —কেহ মারিলেও গ্রাহ্য নাই, প্রাণ ভরিয়া তাহাকে নাম বিলায়!" সন্ধ্যাকালে মালা জপিতে জপিতে সে আপন মনে পাখীটাকে হরিনাম

গাহিতে শিখায়। নন্দ-জননীর হরিগুণ-গান শিখাইবার একটু হাস্যোদ্দীপক বিশেষত্ব আছে। নন্দের পিতার নাম 'হরেকৃষ্ণ'—জ্যেঠার নাম 'রামকৃষ্ণ'। স্বামীর নামও ধরিতে নাই—ভাশুরের নাম করাও পাপ—পাখীটাকেও পড়াইতে হইবে। কাজেই বৃদ্ধা বলে—

ফরে কর্ত্তাটী ফরে কর্ত্তাটী কর্ত্তাটী কর্ত্তাটী ফরে ফরে!
ফরে ফাম ফরে ফাম ফাম ফাম ফরে ফরে!!

পাখী পড়ান শুনিয়া গাঁশুদ্ধ লোক হাসিয়া খুন—বুড়ী তাহাতে জ্বলিয়া আগুন—নন্দ কিছু লজ্জিত। সে একদিন মাকে বলিল—হরিনামে দোষ নাই মা—তুমি ভাল করিয়া পাখী পড়াও! বল—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে!

অরণ্যে রোদন! বৃদ্ধা জিব কাটিয়া ছেলেকে তিরস্কার করিয়া "ও কিরে, শেষ কি জাত ধর্ম্ম যাবে নাকি? আর আমি ত সেই নামই কচ্ছি"—বলিয়াই কুঁজো হইয়া সগর্ব্বে দাঁড়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জোর গলায় বলিতে লাগিল—

ফরে কর্ত্তাটী ফরে কর্ত্তাটী কর্ত্তাটী কর্ত্তাটী ফরে ফরে!
ফরে ফাম ফরে ফাম ফাম ফাম ফরে ফরে!!

নন্দ স্নানার্থ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় রমেশ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ওহে বাপু, এটা কি খাবারের দোকান?

আজ সকাল হইতে নন্দ এক পয়সার দ্রব্যও বিক্রয় করিতে পারে নাই। আগন্তুককে পাইয়া তাহার আহ্লাদ হইল। তাহার উপর চেহারা দেখিয়া সে বুঝিল রমেশচন্দ্র ভদ্রসন্তান। গলায় যজ্ঞোপবীত দেখিয়া নন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল—হাঁ দাদাঠাকুর! আমারই দোকান; আমার নাম নন্দগোপ! আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে—এইটুকু থেকেই কোন রকমে আমার দিন চলে যান! তা দাদাঠাকুর, আপনার কি দরকার বল!

রমেশ। আমার চাল ডাল মিষ্টান্ন—সবই কিছু কিছু চাই!

নন্দ। বেশ—বেশ, তা আপনি একটু এইখানে বিশ্রাম কর ঠাকুরমশাই, আমি একটা ডুব দিয়ে আসছেন—এড়া কাপড়ে ত আর জ্যান্ত দেবতা বামুনের সেবা করতে পারি না!

দেব দ্বিজে নন্দগোপের অগাধ ভক্তি। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—দোকানে কে আছে?

নন্দ। কেউ নেই বাবাঠাকুর। আমাদের গাঁয়ে চোর ডাকাতের ভয় নেই বাবা, তা আপনি বস—আমি এখনই আসছেন।

নন্দ স্নানার্থ প্রস্থান করিল। রমেশ আসিয়া দোকানের দাওয়ায় বসিল। অনেক কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। বিন্দুর মার তিরস্কার, জয়ন্তীর দুরবস্থা, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, শিশুপুত্রের

উচ্ছিষ্ট ভোজন! সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিল ক্ষুন্নিবৃত্তির সকল উপকরণই সম্মুখে সজ্জিত। আনমনে দোকানদারের ছেঁড়া চটখানিতে হাত পড়িবামাত্র পয়সার শব্দ হইল—চট্ তুলিয়া দেখিল ছয় আনা পয়সা! কেউ কোথাও নাই—সুন্দর সুযোগ—বাঁচিবার এক মাত্র উপায়! বিবেকের সঙ্গে রমেশের যুদ্ধ বাধিল! সত্য, ধর্ম্ম—সৎপথ—সৎসঙ্গ—অনেকদিন অনুসরণ করা হইল! পরিণামে দুঃখ দৈন্য লাঞ্ছনা অপযশ! তবে আর কেন? বেশ পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে! রমেশের মুখে হাসি ফুটিল—দেহে বল আসিল—সে কোন দিকে না চাহিয়া দোকান-ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক একটী পাত্রে চাল ডাল যা পাইল সব লইল; বাহিরে আসিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও ছয় আনা পয়সাও গ্রহণ করিল। একবার এদিক উদিক চাহিল—দূর হইতে একটা গানের আওয়াজ তার কাণে প্রবেশ করিল। নন্দগোপ স্নান করিয়া আসিবার সময় গাহিতেছিল:—

সামাল সামাল ও মন ভোলা তোর ডুবল ভেলা!

প্রতিধ্বনির মত রমেশও গাহিল:—

সামাল সামাল ও মন ভোলা তোর ডুবল ভেলা!

বিদ্যুদ্বেগে রমেশ প্রস্থান করিল। পরক্ষণেই নন্দ আসিয়া দেখিল তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

১৮

সব শেষ। জয়ন্তীর বড় সাধের সনৎকুমার বড়কষ্টে মায়ের গলা জড়াইয়া, মায়ের বুকে মাথা গুঁজিয়া শেষ ঘুম ঘুমাইয়াছে! গৃহে মৃত্যুর গভীর নীরবতা! জয়ন্তী মৃতের শয্যাপার্শ্বে মূর্চ্ছিতা— বিন্দুর মা সুকুমারকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। একজন বর্ষিয়সী প্রতিবেশিনী জয়ন্তীকে প্রবোধ দিবার জন্য আসিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছে। অবস্থাপন্ন প্রতিবেশীদিগের কথা এ স্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; সাহায্যের ভয়ে কেহ আর উঁকি মারিল না!

অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। বেলা শেষ হইল। প্রতিবেশিনী জয়ন্তীকে বুঝাইতে লাগিলেন। এমন সময় চাল ডাল মাথায় করিয়া রমেশচন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদি গৃহের কোণে নামাইয়া রাখিয়া সে দুই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; পরে কিয়ৎক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ মৃতের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল; শেষ বলিল—জয়ন্তী! আর কেন—এইবার ওঠ! সনৎ মরেছে— না—না বেঁচেছে! আমি পাগল তাই বলছিলাম—মরেছে! প্রার্থনা কর জয়ন্তী, পরজন্মে সে যেন পেটভরে খেতে পায়! একি, তুমি কাঁদছো! ছি ছি—কেঁদো না—তার অকল্যাণ কোরো না —এই দেখ—আমার চোখে জল নাই!

জয়ন্তী, স্বামীর বুকে মস্তক রক্ষা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কতক্ষণ পরে বলিলেন—কি হবে—ঘরে ত কিছুই নাই—বাছার শেষ কার্য্য!

রমেশ চীৎকার করিয়া বলিল—মা গঙ্গা আছেন! বড় যন্ত্রণা পেয়ে গেছে—এইবার ভাগীরথীর দিব্য নরম ঠাণ্ডা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আস্‌বো! বাবা ঘুমিয়ে বাঁচবে!

"কালী কল্পতরু—শিব জগৎগুরু"—বলিয়া খড়ম পায়ে খটাস্ খটাস্ করিয়া ভজহরি ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল:—তাইতো হে রমেশ ভায়া, তোমার ছেলেটীও ত দেখ্‌ছি না খেয়ে গেল! ভেবো না; শ্রীহরির নাম কর—হরিবোল—হরিবোল!

রমেশ গম্ভীরভাবে বলিল:—এখানে তোমার কি প্রয়োজন ঠাকুর!

ভজহরি। কিছু না—একটী কথা; বলব কি ভায়া, তোমার দাদা আমার কাছে এই বাড়ী বন্ধক রেখেছিল। জান ত ভায়া, শ্যামাপদ সরোজেতে যার মন ভ্রমরা উড়ে বেড়ায়, বিষয় তার বিষ! কিন্তু আমি ছাড়লে কি হবে—আদালত ত আর কথার বাধ্য নয়। কাজেই পেয়াদারা এই সময় নিলামী ইস্তাহার জারি করতে এসেছে! কালী কল্পতরু!

রমেশ উত্তর করিল:—ভাবনা কি, কারুর দেনা পাওনা রেখে যাব না। চল—যা করতে হবে কোরে যাই!

"কিছু না—একটা সই মাত্র; হরি হে"—বলিতে বলিতে নরাধম রমেশের সহিত প্রস্থান করিল।

যথাসময়ে বিন্দুর মার সাহায্যে সনতের সৎকার হইয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরে সুকুমার ও জয়ন্তীকে লইয়া রমেশচন্দ্র জন্মভূমির নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিল।

১৯

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মেটে-মেটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। পল্লীপথ ভাল দেখা যায় না। সুকুমার বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রমেশ ও জয়ন্তী তাহাকে লইয়া একটা পরিত্যক্ত খামারবাড়ীর চালাঘরে আশ্রয় লইল। সেখানে গিয়া ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্যে সেদিনকার মত সকলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। সুকুমার ঘুমাইলে রমেশ নন্দগোপের দোকান হইতে আনীত দ্রব্যসমূহ ও ছয় আনা পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

আজ নন্দ দোকান খুলে নাই। সে গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে যে দিনদুপুরে ডাকাত আসিয়া তাহার দোকান লুট করিয়াছে। গ্রামবাসিগণ সশঙ্কিত। অনেকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে—কেহ কেহ একপ্রহর বেলা থাকিতে আহারাদি সারিয়া ঘরে খিল দিয়াছে। বড় ঘাটে আজ স্ত্রীলোকদিগের সান্ধ্যবৈঠক বসে নাই। নন্দ গ্রহশান্তির জন্য তাহার গুরু বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে জানাইতে গিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বদিন এক শ্রাদ্ধবাড়ীর বিদায় উপলক্ষে ভিন্ন গ্রামে গিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া ডাকাতির কথা শুনিবামাত্র গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। শিষ্য-গৃহে তাঁহার আর যাওয়া হইল না। গ্রহ-শান্তি করিবেন কি—তিনি তখন নিজের ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দোকানের দাওয়ার এক পার্শ্বে গ্রামের বহু লোক নন্দগোপের মহাভারত পাঠ শুনিবার জন্য সমবেত হয়। আজ তিনচারিটী মাত্র লোক আসিয়াছে; তাহাদের মধ্যে রামলাল চৌকীদারও আছে। তাহার সঙ্গে একটা আকাশ-প্রদীপের ন্যায় লাঠি বা বংশদণ্ড। রামলাল বড়ই ভীরু। জোরে আকাশ ডাকিলে সে তাহার ছেলেদের পরিত্রাহি কেনেস্ত্রা বাজাইতে বলে; কিন্তু লোকের কাছে আস্ফালন করে তাহার মত পালোয়ান লাঠিয়াল হুগলী জেলায় আর দ্বিতীয় নাই।

একখানি ছেঁড়া চটের উপর বসিয়া নন্দগোপ তাহার জীর্ণ মহাভারতের একখান গলিত পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে ভাঙ্গা লণ্ঠনের ভিতর একটী টেঁপি জ্বলিতেছে। কেরাসিনের ধূমে কাচগুলি মসীময় হইয়া উঠিয়াছে; তাহা হইতে যাহা একটু আলো বাহির হইতেছে তৎসাহায্যে নন্দগোপ ব্যতীত আর কেহ পাঠ করিতে পারে না। কি পাঠক কি শ্রোতা—বিদ্যায় সকলেই সরস্বতী। দশ বৎসর ধরিয়া মহাভারত পাঠ ও অনুশীলন করিয়া নন্দ সাব্যস্ত করিয়াছে—যুধিষ্ঠিরের পুত্র রামচন্দ্র! শ্রোতাগণের অনেকেই এ সম্বন্ধে পাঠকের সঙ্গে একমত। একছত্র পাঠ করিতে নন্দগোপের ন্যূনকল্পে দুই তিন মিনিট সময় লাগে। পাঠকালে পুঙ্‌ক্তিগুলির যথাযথ উচ্চারণ অপেক্ষা দীর্ঘ সুর লয় তান করিতেই সময় কাটিয়া যায়।

পাঠ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় গৌরকান্তি এক দীর্ঘাকার পুরুষ একটী ছোট ধামা দাওয়ার উপর রাখিয়া ডাকিল—নন্দ!

সকলেই চমকিয়া উঠিল। নন্দ বলিল—কে?

আগন্তুক উত্তর করিল—আমি চোর। তোমার চাল ডাল প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলাম—ফেরৎ দিতে আসিয়াছি। যাহার জন্ত লইয়াছিলাম সে চোরের অন্ন গ্রহণ করিল না!

"চোর" শব্দ শুনিবামাত্র সাহসী চৌকীদার সর্ব্বাগ্রে টেঁপিটা নিভাইয়া দিল। আর সকলে আউ মাউ খাঁউ করিতে লাগিল। নন্দ গোপ—"ও বাপ সকলেরা, কে কোথায় আছ গো—এসো—আমার ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। রমেশ তখন চলিয়া গিয়াছে। গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু একটী প্রাণীও সাহস করিয়া গৃহের বাহির হইল না। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গৃহিণী স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"ওগো, দেখ না গো, ডাকাতে যে গাঁ লুট কোরে নিয়ে গেল!" পৌষ মাসের হাড়-ভাঙ্গা শীত সত্ত্বেও বিদ্যাবাগীশ তখন কুল কুল করিয়া ঘামিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—"ব্রাহ্মণী স্থিরো ভব। সহসা আমি ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়িয়াছি। এ সকল কর্ম্মে ঘর্ম্ম ভাল নয়। সুতরাং এ অবস্থায় দ্বার অর্গলবদ্ধ করাই শাস্ত্রীয় বিধি; নতুবা আরো অনর্গল ঘর্ম্ম নির্গমন হইয়া প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা।"

কেহ আসিল না। নন্দগোপ নিজেই শেষে টেঁপিটা জ্বালিয়া

দেখিল, তাহার যে যে দ্রব্য চুরী গিয়াছিল সবগুলিই চোর ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে। দাওয়ার উপর সাহসী চৌকীদারের 'আকাশ-প্রদীপটী' পড়িয়া আছে কিন্তু মালিক ফেরার! নন্দ এমন অদ্ভুত চুরী কখন দেখে নাই—সে মনে মনে ডাকাতকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

২০

পুণ্যাত্মা ভবেশচন্দ্রের ভদ্রাসন ও বাস্তুভিটা এখন নর-পিশাচ ভজহরির অধিকারে। বহুলোক লাগাইয়া সে বাড়ীখানি শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। তাহার নিজ-গৃহের আসবাবপত্র নূতন বাটীতে আসিতেছে। শীঘ্রই গৃহপ্রবেশের উৎসব হইবে— বাটীর সদরদরজায় সহকার শাখা, মঙ্গলকলস শোভা পাইতেছে। হিংস্র জন্তুগণ আহার্য্যের গন্ধ পাইলে যেমন ছুটিয়া সেইদিকে আইসে, গ্রামবাসী বহু কুলাঙ্গারই তদ্রূপ ভজহরির নূতন বাড়ীতে আসিয়া আত্মীয়তা করিতেছে। ভবেশচন্দ্র থাকিতে দুইদিন পূর্ব্বে এই গৃহে তাহারা ডেও পীঁপ্‌ড়ার মত পড়িয়া থাকিত; আর আজ, যে সেই ভবেশের পরিবারবর্গকে ভিটাচ্যুত করিয়া তাহারই পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটা করায়ত্ব করিয়াছে, সেই নরাধমের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার জন্য তাহারা লালায়িত! জানি না কোন অদৃষ্ট-শক্তির প্রেরণায় মানুষের এমন অধঃপতন ঘটে! হায়রে স্বার্থ!

যথাসময় হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওরফে 'চাটুয্যে মহাশয়' তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্বগ্রামে আসিয়া ভজহরির ব্যাপার সমস্ত শুনিলেন। ক্রোধে চক্ষু কর্ণ দিয়া তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুষ্টের দমন না করিয়া তিনি অন্ন গ্রহণ করিবেন না। আইনজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া—তাঁহার নিকট ভবেশচন্দ্রের যে প্রকৃত বন্ধকী খত ছিল তাহা লইয়া থানায় উপনীত হইলেন। সেই দিনই নালিশ রুজু ও সঙ্গে সঙ্গে ভজহরির নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইল। চাটুয্যে মহাশয় ফাঁড়িদারের সহিত ভজহরির গৃহে উপস্থিত হইলেন।

তখন ভজহরি বড় ব্যস্ত। অনেক শিষ্যসেবক জড় হইয়াছে; অনেক যুবতী প্রৌঢ়া—গৃহ-সংস্কার করিতেছে; ঠাকুর থাকিয়া থাকিয়া 'কালী-করাল-বদনা, 'বৃন্দে, বৃন্দাবন বিলাসিনী' ইত্যাদি বলিয়া পৈশাচিক চীৎকার করিতেছে।

বহির্ব্বাটী হইতে হারাণচন্দ্র ভজহরিকে ডাকিলেন। জমাদার পশ্চাতে রহিল। ভজহরি বাহিরে আসিয়াই হারাণচন্দ্রের সহিত আত্মীয়তা করিতে গেলেন। চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন—"ভবেশ তো মারা গিয়াছে; রমেশ, বৌ-মা—এঁরা সব কোথা গেলেন?"

'ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম' বলিয়া ভজহরি বক্তৃতা আরম্ভ করিল। সে বলিল—"সে কথা আর বোলো না দাদা। রমেশটা একটা আসল গড্ডালিকা; কি আর বলব, একেবারে ষণ্ড অবতার! নেশাভাঙ্ ক'রে সব উড়িয়ে দিয়েছে। এত করে বললুম পাঁচশো টাকায় আমার কাছে তোর দাদা বাড়ী বন্দক দিয়েছে—বেশ করেছে; তা এখন ভাল হ'য়ে থাক, ক্রমে না হয় দেনা শুধিস। ব্যাটা সে পাত্রই

নয়—একেবারে ভাগড়বা। কাজেই ভবেশদাদার ভিটেটায় যাতে সন্ধ্যেটী জ্বলে তার একটা ব্যবস্থা করছি। এলোকেশী দেখা দাও!

চাটুয্যে মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—ভবেশ তোমায় বাড়ী বন্ধক দিয়েছে?

ভজহরি। নিশ্চয়।

হারাণ। মিথ্যা কথা! তুমি জোচ্চোর, জালিয়াৎ, পাষণ্ড!

ভজহরি। কুলকুণ্ডলিনী—জাগো, জাগো! হারাণ, কার সঙ্গে কথা কইছ জানো?

হারাণ। জানি একটা শঠ, প্রবঞ্চক, ভণ্ড, কুলাঙ্গারের সঙ্গে। তুমি এখানে কেন? তোমার স্থান জেলখানায়!

হারাণচন্দ্র জমাদারকে ডাকিলেন। জমাদার আসিয়া ভজহরির হাত ধরিল। ভজহরি রক্তচক্ষে বলিয়া উঠিল—করিস্ কিরে ব্যাটা? জানিস্, এখনি ভস্ম করে ফেলবো! একশোমুখো রুদ্রাক্ষ চাল্‌লে তোর কি হবে জানিস্?

'চোপরাও শালা' বলিয়া দুইটা রুলের গুঁতা দিয়া জমাদার ভজহরির হাতে হাতকড়ি পরাইল। গতিপথে দুষ্ট অনেক অভিনয় করিল। তাহাকে লইয়া গেলে ভবেশচন্দ্রের সাধের বাস্তু-ভিটায় হারাণচন্দ্র শিবস্থাপনা করিয়া ধন্য হইলেন। যথাকালে আদালতের বিচারে ভজহরির জাল করার অপরাধে সাত বৎসরের

কারাদণ্ড হইল। জেলখানায় গিয়াও সে দুর্বৃত্ত কয়েদীদের কাছে তাহার মজ্জাগত ভণ্ডামী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু "কৈবল্যদায়িনী" ওলাবিবির সাহায্যে অচিরাৎ তাহার মনের সকল কালি মুছিয়া দিয়াছিলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

অদৃষ্টের পরিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড।

১

শ্রীমন্ত যখন তাহার পিতার সন্ধানহেতু সিংহলগমনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া মাতৃপদে নিবেদন করেন তখন খুল্লনা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"জলে কুম্ভীরের ভয় কূলে শার্দ্দুলের চয়
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ সে পায় বহুত ক্লেশ
প্রাণ নাহি বাঁচে কোন মতে॥
উড়ুব কচ্ছপগুলা শশা যেন মশাগুলা
জলোকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার।
রাজা বড় পাপচিত্ত ছলে হরি লয় বিত্ত
শুনেছি দেশের দুরাচার॥"

ইহা অতি প্রাচীনকালের কথা। আমাদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সময়ে বঙ্গের পল্লীবাসিগণ রাজধানী কলিকাতা সহরকে বাঘের ন্যায় ভয় করিত। সিংহলের "উড়ুব কচ্ছপগুলা, শশা যেন মশাগুলা,

জলৌকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার" ইত্যাদির স্থায় কত কথা পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে শুনা যাইত। সহরে গেলে জাতি-ধর্ম্ম থাকে না—কীরিচ হাতে লালমুখ গোরা, দোরাঙ্গাদাড়িযুক্ত মুসলমানবাবুর্চ্চির দ্বারা জোর করিয়া শিক-কাবাব খাওয়াইয়া জাত মারে—অনেক সময় যাদু করিয়া মরা জন্তুর যে যাদুঘর আছে তাহার ভিতর পুরিয়া রাখে। সভ্যতা শিখিবার জন্য তাহাদের আবার নাকি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় চতুষ্পদ জন্তুদিগের সঙ্গে কিছুদিন থাকিতে হয়। রোগ হইলে কোম্পানীর হাসপাতাল ভিন্ন গতি নাই। সেখানে নাকি রাত্রিতে বড় বড় পাঞ্জাবী পালোয়ান গিয়া পীড়িতদিগকে ঠ্যাং ধরিয়া চরকী-বাজির মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধাপার মাঠে ফেলিয়া দেয়! এই সকল কারণে নীরিহ শান্তিপ্রিয় পল্লীবাসীরা কখন নাগরিক-জীবন পছন্দ করিত না। ফলে যা রটে তার কিছু বটে। তবে অতিরঞ্জন করা মানুষের স্বভাব; নতুবা শশার মত কখন মশা হয় না—করীশুণ্ডের স্থায় জোঁকও কখন দেখা যায় নাই! সহরের আবহাওয়া পল্লী হইতে ভিন্ন। তাহাতে পল্লীবাসীর সমূহ বিপদ্। তাই গ্রাম সহর চিনিত না—সহর গ্রামের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিত। সেইজন্য বিলাসময়ী নগরীর প্রলোভনপূর্ণ অঙ্কে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শিক্ষার জন্যও পুত্রকে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন। সুকুমারমতি কিশোরগণও এখনকার মত পাশের পড়া পড়িতে সহরে আসিয়া ফুটবল, ক্রিকেট ম্যাচ্ দেখিয়া, সখের থিয়েটার করিয়া এবং প্রাসাদতুল্য হোষ্টেলের

ত্রিতলে বিদ্যুতালোকিত গৃহে সস্তার হারমোনিয়ম সহযোগে অনৈক্য-তানে ঐক্যতান বাদন করিয়া দেশের ক্ষুদ্র কুটিরখানিকে ঘৃণা করিতে শিখিত না। তাহারা পল্লীর প্রশস্ত ময়দানে হাডু-ডু-ডু ইত্যাদি গ্রাম্যক্রীড়ায় এবং প্রকাণ্ড দীঘি সন্তরণে পার হইয়া দেহে স্বাস্থ্যের লাবণ্য মাখিয়া যৌবনে পদার্পণ করিত।

মানকরের জমিদার ৺রাজমোহন মুখোপাধ্যায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া পুত্র ললিতমোহনকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় পাঠাইয়া-ছিলেন। সে তরুণ বয়সে সহরে দাস-দাসীপরিপূর্ণ বিশাল অট্টালিকায় বাস করিয়া লেখাপড়ার সঙ্গে আরও নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া তাহার এক বন্ধু জুটিয়া-ছিল। তাহার নাম নৃত্যগোপাল। নৃত্যগোপাল জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু সে কলিকাতার আদব-কেতায় দুরস্ত হইয়া গায়ত্রী মন্ত্র হাবড়ার পুলের তলে বিসর্জ্জন দিয়া পৈতাগোছা বোধ করি বা রজকালয়েই প্রেরণ করিয়াছিল। এই অভিভাবকহীন "পাড়াগেঁয়ে" জমিদার-তনয়কে বশ করিতে তাহার সময় লাগে নাই। সে প্রথমেই ললিত-মোহনকে বুঝাইল, কেতাব-কীট হইয়া সারাদিন বাটীতে বসিয়া অবসর যাপন করা শুধু যে বোকামী এরূপ নহে, স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনিষ্টকর। বিশেষ কলিকাতার ন্যায় আজব সহরখানার সঙ্গে পরিচয় হওয়াও ত প্রয়োজন। নতুবা হয় ত ঠকের হাতে পড়িয়া কোন্ দিন ঠকিতে হইবে।

ফলে ললিতমোহন র‍্যাংকিনের বাড়ীর পোষাকে সজ্জিত হইয়া, ঘরের গাড়ীতে করিয়া জুয়াচোরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সহরের নানাস্থান চিনিয়া যখন গভীর রাত্রে ফিরিত তখন তাহার মুখে মুসলমান বাবুর্চ্চির শিক্ষিত হস্তের প্রস্তুত নানা জীব-জন্তুর মাংসের ও অন্য এক প্রকার উৎকট গন্ধ পাওয়া যাইত।

এই সময়টায় রাজমোহনের অবস্থা সাপের মূষিক গলাধঃকরণের মত হইয়াছিল। পুত্রকে অর্থ যোগাইতে আলস্য করিলে সে লিখিত—"জমিদারের ছেলের মত কলিকাতায় থাকিতে হইবে ত? সে যে দুপয়সা খরচ করে, তাহা তাহার পিতারই মানরক্ষার্থে।" এ কথা শুনিয়া রাজমোহন আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। ফলে ললিতমোহন কলিকাতায় থাকিয়া প্রাণপণে পিতার মানরক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুদিন অতিরিক্ত খরচ জোগাইয়া যখন প্রকৃত ব্যাপার তিনি অবগত হইলেন তখন ললিতমোহনের আর পদার্থমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। তখন একটি উপসর্গ এই তরুণ শাঁসালো জমিদারপুত্রকে ভর করিয়াছে। পিতা টাকা পাঠান বন্ধ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন; উত্তরে উপযুক্ত পুত্র সবিনয়ে পিতৃপদে নিবেদন করিল—"এক গুণ লইয়া চার গুণ লিখিয়া দিলে কলিকাতা সহরে মহাজনের অভাব হয় না।" দেনার দায়ে জমিদারী নীলামে উঠিবার আশঙ্কায় বৎসরখানেক খরচ জোগাইয়া তিনি হৃদিভঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পুত্র তখন কলিকাতায় কামিনীকাঞ্চনের সেবায় উন্মত্ত। সে শ্রাদ্ধের সময় সুকর্ত্তিত কেশের মূল্য ধরিয়া দিল এবং মাত্র বিলাতী মদ্য-ব্যবসায়ীরই সহস্রাধিক মুদ্রার বিল শোধ করিয়া মহা সমারোহে পিতৃ-শ্রাদ্ধ সমাধানপূর্ব্বক মৃত পিতাকে বোধ করি বা হিন্দুর চিরবাঞ্ছিত গোলকধামেই পাঠাইয়া দিল!

পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে আসিয়া ললিতমোহন একটি নবীন অভিজ্ঞতা লাভ করিল। প্রথম, এখানে তাহারই রাজত্ব; পিতার অবর্ত্তমানে কেহ কিছু বলিবার নাই। নদীতীরস্থ উদ্যান-বাটিতে উপসর্গটিকে রাখিলে আমোদও যেরূপ অসীম—ব্যয়ও সেই-রূপ অল্প, কর্ম্মচারীরাও জব্দ থাকে। কিন্তু নৃত্যগোপাল নহিলে আমোদ হয় না। সুতরাং পুরাতন নায়েবকে স্বর্গীয় রাজমোহন যে ইষ্টকালয় বাস করিতে দিয়াছিলেন—নবীন প্রভুর প্রয়োজনে তাঁহাকে সে গৃহ শূন্য করিয়া দিতে হইল; এবং তাঁহার স্থলে নৃত্যগোপাল সেই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জমিদারের প্রভু হইয়া সগর্ব্বে বিরাজ করিতে লাগিল।

২

জমিদারীর খাজানা আদায় বিষয়ে সদর নায়েব নৃত্যগোপালের খুব লক্ষ্য ছিল। এজন্য তাহার সহিত প্রজাবর্গের প্রায়ই বাক্‌বিতণ্ডা হইত। গরীবের কাতরোক্তি, অসমর্থের অনুনয়, পীড়িতের প্রার্থনা তাহার সমবেদনাবিহীন হৃদয়কে কিছুমাত্র স্পর্শ করিত না। প্রজা-পীড়ন তাহার নিত্যনৈমিত্তিক প্রমোদের অন্তর্গত ছিল। জমিদারের যথারীতি খাজানা—তাহার উপর নায়েব মহাশয়ের নজর-সেলামী না দিতে পারিলে কোন প্রজার নিস্তার নাই। দুস্থ অক্ষম প্রজারা অনেকসময়ই দুই দিক্ রক্ষা করিতে পারে না ফলে তাহাদের অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। কাছারী-বাড়ীর পশ্চাতে দীর্ঘ প্রাচীর-বেষ্টিত একটী বৃহৎ বাগান ছিল। এইখানেই নৃত্যগোপাল প্রজা-মেধ-যজ্ঞ-কার্য্য সম্পন্ন করিত। মায়ের সম্মুখে ছেলের বুকে পাথর চাপাইয়া—স্বামীর উপস্থিতিতে পত্নীর লজ্জা-ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া—চণ্ডালকে দিয়া ব্রাহ্মণকে নির্য্যাতন করিয়া নৃত্যগোপাল আহ্লাদে করতালি দিত। এতদ্ব্যতীত বন্ধন, বেত্রাঘাত, রাংচিত্রের আটা সহযোগে শরীরে ক্ষতকরণ ইত্যাদি বহুবিধ পীড়নের মুষ্টিযোগ ছিল। জমিদার প্রজা সম্পর্কে এবংবিধ অত্যাচারের অনুষ্ঠান বঙ্গে

বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। নিরীহ প্রজাগণ চুরী ডাকাতি জানে না—মিথ্যা প্রতারণা শিখে নাই—মাটি কাটিয়া, ধান ভাণিয়া, চাষ করিয়া কোনরূপে দিনপাত করে। অজন্মায় তাহাদের অনসন অর্দ্ধাসন—শরীর ভাঙ্গিলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন—শেষ মৃত্যু! অভাব যাহাদের ঋণশোধের অন্তরায়—তাহাদের প্রতি জমিদার কেন পীড়ন করেন? ইহার কারণ একজন প্রবল—একজন দুর্ব্বল; একজন ভাগ্যবান্—একজন ভিখারী; একজন রাজা—একজন প্রজা! অবস্থার তারতম্যের ইহাই বিশেষত্ব! কিন্তু এ অত্যাচারের কি প্রতীকার নাই? আছে। সে প্রতীকার করেন ঈশ্বর। তাঁর হাত কেহ কখন এড়াইতে পারে না!

উৎপীড়িত অত্যাচারক্লিষ্ট প্রজাগণ অনন্যোপায় হইয়া জমিদার ললিতমোহনের শরণাগত হইল। উচ্ছৃঙ্খল যুবক ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। তখন অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। পুরাতন কর্ম্মচারীরা নৃত্যগোপালকে গিয়া জানাইল—"হুজুর, এরূপ করিলে জমিদারী রক্ষা সুকঠিন হইবে। তিনখানা মহল একরূপ প্রজাশূন্য হইয়াছে!" নৃত্যগোপালের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। ললিতমোহন উৎসন্ন যাক্—তাহাতে কি আসিয়া যায়; তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ হইলেই হইল।

একদিন প্রাতঃকালে জমিদার-গৃহের বহির্ব্বাটীতে প্রজামণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছে। নৃত্যগোপাল শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায়

রোষনেত্রে বসিয়া আছে। প্রজাবর্গের বস্ত্রাঞ্চল হইতে যথাক্রমে টাকা, সিকি ইত্যাদি বহির্গত হইতেছে। কিন্তু নৃত্যগোপালের ক্ষুধা মিটিতেছে না। প্রজাগণ জোড় হস্তে নতজানু হইয়া দয়ার প্রার্থী হইলে সে রক্তচক্ষে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা গারদের ভয় দেখাইয়া বলিল —ওসব ভণ্ডামি এখানে চলবে না বাপু! যেমন করে হ'ক টাকা আমার চাই।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় ললিতমোহন গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার মূর্ত্তি অতি ভীষণ, দেহ রুধিরাক্ত, পরিচ্ছদের স্থানে স্থানে রক্তের দাগ, চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি, মুখমণ্ডল প্রখর উত্তেজনায় আরক্ত। সে সুরাপানে বিভোর—তাহার সমস্ত শরীর স্থৈর্য্যহীন হইয়া যেন টলমল করিতেছে। সকলে সে মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

চতুর নৃত্যগোপাল ললিতমোহনের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়া লইল, কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সে ইহাও বুঝিতে পারিল যে প্রজাবর্গের মনেও একটা সন্দেহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কিছু জানিতে দেওয়া হইবে না। কৌশলী নৃত্যগোপাল কোনরূপ বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিয়া উঠিল— "এই যে কর্ত্তা! ওঃ—আজ যে খুব শীকার হ'ল দেখছি! যাও— যাও—ভিতরে গিয়ে পোষাক বদলাওগে; কেথাও লাগেনি ত?" বলিতে বলিতে নৃত্যগোপাল উপস্থিত প্রজাবর্গকে বলিল—"ওহে,

আজ তোমরা যাও—খাজানা এর পরে দিয়ে যেও। আজ শিকার কত্তে গিয়ে বাবু বড় কষ্ট পেয়েছেন ; আমি দেখি কোথাও লেগেছে কি না।”

খাজানা দেওয়ায় অব্যাহতি পাইয়া আর দ্বিতীয় কথাটী না বলিয়া সকলে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

প্রজাবর্গ প্রস্থান করিলে পর নৃত্যগোপাল ললিতমোহনের কক্ষে গিয়া দেখিল, একখানা আরাম-কেদারায় ললিত অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। সে তখনও বস্ত্রত্যাগ করে নাই। তাহার শিথিল মুষ্টিমধ্যে একটা পিস্তল। তখন অস্ত্র আইনের এত কড়াক্কড় হয় নাই। অনেকের—বিশেষতঃ বর্দ্ধিষ্ণু লোকের গৃহে তখন পিস্তলের অভাব ছিল না। নৃত্যগোপালকে দেখিয়া সে বজ্রমুষ্টিতে পিস্তলটা চাপিয়া ধরিল ; পরে শুধু কহিল—এই পিস্তলে অবিশ্বাসিনী কামিনীর শেষ করে এলুম।

কামিনী লোলিতমোহনের রক্ষিতা ছিল।

নৃত্যগোপাল চমকিল। পরে বলিল—আচ্ছা সব শুন্‌ছি, তুমি পিস্তল আমায় দাও।

ললিতমোহন সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না—শয়তানীর শেষ করেছি ; কিন্তু শয়তানের কিছু কত্তে পারিনি ; আগে তার শেষ কর্ব্ব।

মনে মনে নৃত্যগোপাল প্রমাদ গণিল। এখনি পুলিশ আসিয়া

পড়িলে কি হইবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল; পিস্তল কাড়িয়া লইয়া অনেক কষ্টে ল'লতকে স্থির করিয়া বসাইল। পরে তাহার অসংলগ্ন উক্তির মধ্যে যাহা বাহির হইল তাহা এই ঃ—

কল্য রাত্রে মত্তপানে মত্ত হইয়া সে যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন রাত্রি ১টা হইবে। রাত্রি তিনটার পর তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল কামিনীর শয্যা শূন্য। সে বাহিরে গিয়া দেখিল দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ। উন্মুক্ত জানালার কাছে আসিয়া সে দেখিল উদ্যানে কামিনী এক যুবার আলিঙ্গনে বদ্ধ। তাহার শোণিত উত্তপ্ত হইল। দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সে দেখিল প্রণয়ী-যুগল আলিঙ্গনমুক্ত। সে ছ-নলা পিস্তলে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দুইটী গুলি ছুঁড়িল। প্রথমটী কামিনীকে ভূপতিতা করিল। অপরটী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। যুবা প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিল। সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

লোকালয় হইতে দূরে—উদ্যানে গুলির শব্দ কাহাকেও জাগাইল না। কেবল বাগানের দরওয়ান পাঁড়েজীব রুদ্ধদ্বার গৃহের মুক্ত বাতায়নটী সশব্দে রুদ্ধ হইল। প্রভাতে ললিত বাহির হইয়া দেখিল, এক গ্রামবাসী দ্বারপথে পতিতা কামিনীকে দেখিতেছে। ললিতকে দেখিবা মাত্র সে পলাইল—নিশ্চয় পুলিশে সংবাদ দিতে। পাঁড়েজীর ঘর তখনও রুদ্ধ। ললিতমোহন উদ্যানে আসিয়া কামিনীর দেহ তুলিয়া দেখিল—সে মৃতা। তারপর সে টলিতে টলিতে গৃহে

আসিবার সময় শুনিল, পাঁড়েজী রুদ্ধকণ্ঠে "রাম নাম সত্য হ্যায়" করিতেছে।

ললিতের কাহিনী শেষ হইবামাত্র ভৃত্য দারোগাবাবুর আগমন-সংবাদ দিল। নৃত্য ললিতকে রাখিয়া একাকী দারোগা বাবুর সহিত দেখা করিল। দারোগার উচ্চকণ্ঠ ক্রমেই খাদে নামিতে লাগিল; শেষে অনেক গোপন পরামর্শের পর স্থির হইল—জানাজানি হইয়া গিয়াছে—খুন আর চাপা যায় না; কাহাকেও আসামী খাড়া করা দরকার এবং ললিতের এখনই অন্ততঃ তিন মাসের জন্য গ্রাম ত্যাগ করা বিধেয়। দারোগা "পান" খাইয়া বিদায় লইল।

৩

দুঃখ যখন আসে সে তাহার পালা সাঙ্গ না করিয়া যায় না। রমেশের দুর্দ্দশার অবধি নাই—পরিধানে ছিন্ন কন্থা, অন্নাভাবে ক্ষীণ-দেহ। সে আজ সহায়শূন্য, আশ্রয়হীন, ভিক্ষুক—লজ্জা মান সর্ব্বস্ব হারাইয়া স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া পথে দাঁড়াইয়াছে। দৈন্যের কঠোর পীড়নে পীড়িত হইয়া হতভাগ্য ঈশ্বরের কাছে দুঃখ জানায়, কিন্তু ব্যথিতের আকুল ক্রন্দন—তাপিতের তপ্তশ্বাস ব্যর্থ হাহাকারে মিলাইয়া যায়। সুকুমারের অনশনক্লিষ্ট শুষ্ক মুখখানির প্রতি চাহিয়া, জয়ন্তীর জলভারাক্রান্ত চক্ষু দুটী দেখিতে দেখিতে সে ভাবে, তাহার দুঃখময় জীবনের একমাত্র সুহৃদ্ মৃত্যু। দিনের পর দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শূন্যহস্তে নিরাশার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় যখন সে স্ত্রী-পুত্রের সম্মুখীন হয়, তখন কাতরকণ্ঠে করযোড়ে মৃত্যুকে আবাহন করিয়া বলে—"এসো মৃত্যু—এসো অনন্তের কুক্ষিগত মহান্ধকারের চিরভীতিময়ী প্রেতনী—এসো সর্ব্ব-সংহারক মহাকালের নিত্য-সহচরী বিভীষিকাময়ী ছায়া—এসো শ্মশান শিবাসঙ্গিনী, নরকঙ্কালমালিনী, ধ্বংসরূপিণী—তোমার তুষার-শীতল কর-স্পর্শে এ জ্বালাময় জীবনের সকল যন্ত্রণার অবসান কর!" মায়ামুগ্ধ মানব মনে মনে যাহা করিতে ইচ্ছা করে, কার্য্যকালে তাহা

পারে না। রমেশকে দেখিলে এ কথার মর্ম্ম স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারা যায়। মৃত্যুকে ডাকিতে ডাকিতে যখন তাহার জয়ন্তী সুকুমারের কথা মনে পড়ে তখনই তাহার মন অন্য দিকে ধাবিত হয়। সে ভাবে—"মরিলে তাহার জ্বালা জুড়াইবে বটে, কিন্তু তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে—কে তাহাদের দেখিবে—কে তাহাদের জন্য কাঁদিবে ?" ভাবিতে ভাবিতে রমেশের মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়—অন্তরের পুঞ্জীভূত দুঃখরাশি তপ্ত অশ্রুধারে পরিণত হইয়া হতভাগ্যের পাণ্ডুর গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে থাকে। তখন তাহার দাদার কথা মনে পড়ে—সে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে! পুণ্যাত্মা ভবেশ চন্দ্র, তোমার চিরন্তন শান্তি-নিবাস হইতে একবার মরলোকের প্রতি চাহিয়া দেখ—তোমার বড় সাধের, বড় যত্নের রমেশের আজ কি দশা হইয়াছে!

আশ্রয়ানুসন্ধানে ব্যর্থশ্রম রমেশ স্ত্রী-পুত্র লইয়া এক বৃক্ষতলে অবসন্নদেহে বসিয়া পড়িয়াছে। নিদাঘের প্রচণ্ড রবি প্রখর কিরণ-চ্ছটায় সমগ্র প্রকৃতিকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। শ্যামচ্ছায়া তরুমূলে ক্লান্ত গাভীর দল শ্রান্তদেহ ঢালিয়া দিয়া রোমন্থন করিতেছে। কর্ম্ম-ময় জগৎ ক্ষণকালের জন্য বিশ্রামের ক্রোড়ে নিমজ্জিত। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। কেবল শ্রমাতুর কৃষকের মৃদু সঙ্গীতধ্বনি মুক্তসমীরণে ভাসিয়া আসিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে অদূরস্থ কাছারীর সময়-নির্দ্দেশকারী ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হইয়া প্রতিধ্বনি সহকারে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

নিদ্রিত সুকুমারের অনশনক্লিষ্ট দেহখানি সযত্নে ক্রোড়ে লইয়া জয়ন্তী নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছেন। রমেশ দেখিল সুকুমারের রোগশীর্ণ ক্ষীণ দেহখানি ছায়া হইয়া মায়ের কায়াতে মিশিয়া গিয়াছে। অদূর অতীতের করুণ স্মৃতিগুলি একে একে জাগিয়া উঠিল। তাহার দুঃখময় জীবনের উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে। জীবনে কত সয়? জেলের শাস্তিভোগ—পিতৃতুল্য অগ্রজের দেহত্যাগ—অন্নাভাবে শিশুপুত্রের মৃত্যু—স্ত্রী-পুত্রের করুণ হাহাকার—সাহায্যের জন্য পরের কাছে লাঞ্ছনা—অনন্যোপায় হইয়া পরদ্রব্য লুণ্ঠন—অন্নের জন্য মান-ইজ্জতে জলাঞ্জলি—ভাগ্যবিপর্য্যয়ে শত্রু-পক্ষের কপট সান্ত্বনা—জয়ন্তীর ন্যায় সাধ্বীর দুর্দ্দশা! জীবনে কত সহ্য হয়?

"জয়ন্তী তোমরা থাক—আমি আসছি; দেখি যদি কিছু কত্তে পারি" বলিয়া ক্লান্তদেহখানি কষ্টের সহিত তুলিয়া রমেশ ধীরে ধীরে পথ ধরিয়া কাছারী অভিমুখে চলিল।

ফলশোভিত বৃক্ষগুলি ফলভারে নত হইয়া পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। রমেশ সেই ফল দেখিয়া ভাবিল—"ইহাতে ত সুকুমারের ক্ষুধা মিটিবে।" সে আর দ্বিধা করিল না; হাত বাড়াইয়া নিকট হইতে দুই চারিটী ফল পাড়িয়া লইল।

রমেশের এ কার্য্য কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না—কেবল বৃক্ষান্তরালস্থিত কাছারীগৃহের সম্মুখে উপবিষ্ট অর্থোপার্জ্জনের জন্য

শীকার-অন্বেষণকারী জমাদারের শ্যেনচক্ষু এড়াইতে পারিল না। রমেশ ফল লইয়া যেমন ফিরিয়া আসিবে, পিছন হইতে জমাদার গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—"এই শালা খাড়া রও"। রমেশ ফিরিয়া দেখিল—দীর্ঘশ্মশ্রু, বিশালদেহ, জমাদার হস্তে সুদীর্ঘ যষ্টি লইয়া তাহার কাছে আসিতেছে; সরকারীবৃক্ষের ফল চুরী অপরাধে এখনই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

জমাদার অনেক চেষ্টা করিয়া যখন বুঝিল কপর্দ্দকশূন্য রমেশের কাছ হইতে আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন এতাবৎকাল নিজকর্ত্তৃক ফললুণ্ঠনের একটা যোগ্য কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ পাইয়া রমেশকে ধরিয়া লইয়া কাছারীতে চলিল।

———

৪

খুনের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে। গ্রামে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আসামী এখনও ধরা পড়ে নাই। তাই সর্ব্বত্র পুলিশ-অনুসন্ধান চলিতেছে। পুলিশদর্শনে নিরীহ গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ বড় একটা গৃহের বাহির হয় না। যেখানে খুন হইয়াছে সে পথ কেহ মাড়ায় না। আসামীকে পাকড়াও করিতে পুলিশের চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই।

কাছারী-গৃহে অদ্য এইজন্যই একটি গোপন বৈঠক বসিয়াছে। দারোগা, নৃত্যগোপাল ও তাহার দু-চার জন বন্ধুতে মন্ত্রণা হইতেছে। দারোগার উপদেশ অনুসারে নৃত্যগোপাল ললিতমোহনকে গ্রাম হইতে সরাইয়া দিয়াছে। উপযুক্ত আসামী খাড়া করিবার জন্য অনেক যুক্তিতর্ক চলিতেছে। কিন্তু কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইতেছে না। বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন বলিল—ওহে এক কায কর—গ্রামের মধ্যে ছোট লোক হাড়ি, বাগ্দী অনেক আছে, তাদের ভেতর একজনকে টাকা দিয়ে বশ কর। তাহলেই কায হাঁসিল হয়ে যাবে।

নৃত্যগোপাল কহিল—কিন্তু খুনের ব্যাপারে কেউ যে স্বীকার

হবে বলে ত বোধ হয় না। সাধারণ চুরি টুরি হ'ত, টাকার লোভে অনেকে এগোতো।

নৃত্যগোপালের বন্ধু বলিল—ওহে, ছোটলোক বেটাদের জান না, টাকার জন্যে ওরা সব কত্তে পারে; প্রাণ যাবে না এই আশ্বাসটুকু দিতে পারলেই হল।

নৃত্যগোপাল কহিল—কিন্তু কি জান, ও সব ছোটলোকগুলো নিরক্ষর,নির্ব্বোধ। শেষটা কাজ হাঁসিল করতে গিয়ে সব ফেঁসে যাবে। আর কামিনী একটা উচুদরের বেশ্যা, একটা ছোটলোক যে তার কাছে ঘেঁস পাবে, তা কেউ বিশ্বাস করবে না।

বন্ধু কহিল—তা ভদ্রলোক কে এমন আছে যে, মান খুইয়ে এ কুৎসিত ব্যাপারে এগোবে বল? আর ছোটলোক অমন বেশ্যাদের আপনার জন হয়ে থাকে। পরস্পরের ভেতর ঝগড়াঝাটি হয়ে খুন খারাপিও হতে দেখা গেছে।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় রমেশকে লইয়া জমাদার দারোগার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ফলচুরির কথা বলিল—আর এই চোরই যে সময়সুযোগ বুঝিয়া রাত্রের অন্ধকারের ভিতর তাহার চক্ষে ধুলা দিয়া সমস্ত গাছগুলি ক্রমে ক্রমে ফলশূন্য করিয়া ফেলিতেছে তাহাও সগর্ব্বে জানাইয়া দিল।

দারোগা কহিল—তুমি চুরি করেছ?

রমেশ বিনীতভাবে উত্তর করিল—হাঁ হুজুর।

দারোগা। চুরি কল্লে শাস্তি হয় জান ?

রমেশ। জানি।

দারোগা। তবে চুরি কল্লে কেন ?

রমেশ। আমার এক শিশুপুত্র সমস্ত দিন অনাহারে রয়েছে। আমার কিছু নেই যে খাওয়াই। পরের দ্বারে ভিক্ষা করে কিছু পাই নি। তাই তার জন্য এই ফল দুটী নিয়ে যাচ্ছিলুম!

সকলে সকৌতূহলে রমেশকে দেখিতে লাগিল।

দারোগা। তোমার বাড়ী কোথায় ?

রমেশ। আমার বাড়ী নেই; তিন দিন ধরে আশ্রয়ের চেষ্টায় স্ত্রীপুত্র নিয়ে পথে পথে কাটাচ্ছি।

রমেশের সুদীর্ঘ পৌরুষমূর্ত্তি সকলেই লক্ষ্য করিয়া দেখিল। তাহার অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত— মুখমণ্ডল শোকভারে মলিন— আয়ত ললাটে দুঃসহ চিন্তার রেখা। দেখিলেই মনে হয় কোন উচ্চবংশীয়, ভাগ্য-দোষে দৈন্যের গ্রাসে নিপীড়িত। নৃত্যগোপাল ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার পরিচয় কি ?

রমেশ কহিল—মার্জ্জনা কর্ব্বেন, পরিচয় দেবার আমার কিছু নেই; থাকলেও দিতে অক্ষম। আমি এখন দীনহীন, পথের ভিখারী। আমি চুরি করেছি; আমার শাস্তি দিন।”

রমেশ পরিচয় দিতে অসম্মত হওয়ায় নৃত্যগোপালের ধারণা বদ্ধমূল হইল যে সে ভদ্রসন্তান। নৃত্যগোপাল হাতে চাঁদ পাইল।

ইহার দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সস্নেহে নম্রভাবে সে রমেশকে কহিল—যদি আমরা তোমাদের আশ্রয় দিই?

রমেশ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। এ কি ব্যঙ্গ! সোৎসুকে সে নৃত্যগোপালের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে কহিল——আপনারা আশ্রয় দিবেন?

নৃত্যগোপাল কহিল—হাঁ, তোমাদের আশ্রয় দেব, যদি একটা কাজ কত্তে পার?

কাজ? কত গুরুতর কাজ আছে? আশ্রয়ের বিনিময়ে রমেশ সমস্ত করিতে প্রস্তুত। যদি প্রাণ দিতে হয় সে হাসিমুখে দিবে। জয়ন্তীর ত গতি হইবে—সুকুমার ত প্রাণে বাঁচিবে!

সাগ্রহে রমেশ কহিল—বাবু, আমায় যা বলবেন আমি করব; কেবল একটু আশ্রয় দিন—আমার স্ত্রীপুত্রকে বাঁচান।

নৃত্যগোপাল রমেশকে বসাইয়া বেশ শান্তভাবে বলিল—তবে শোন; কোন ভদ্রলোক একটা চুরীর অভিযোগে পড়েছে। যদি তুমি নিজে সে অপরাধ স্বীকার কর, তবেই সে ব্যক্তি রক্ষা পায়। এতে সামান্য দিন কয়েক তোমাকে জেলে থাকতে হবে মাত্র। তারপর ফিরে এসে তোমার স্ত্রীপুত্র নিয়ে আমাদের আশ্রয়ে কাটাবে। যতদিন না তুমি ফের তোমার স্ত্রী-পুত্রদের আমরা যথোচিত যত্নে রেখে দেব।

রমেশ ভাবিল—এই সামান্য কাজ, এর জন্য আশ্রয় মিলিবে!

দিনকয়েক মাত্র জেলে বাস করা। এ যে তার কাছে স্বর্গ-বাসের তুল্য। রমেশ সাগ্রহে কহিল—বাবু, আমি এখনই এ কার্য্যে স্বীকৃত, বলুন আমায় কি করতে হবে ?

নৃত্যগোপাল সমাদরে কহিল—আচ্ছা, আপাততঃ তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসো। অভুক্ত রয়েছো—সকলে আহারাদি কর ; খাওয়ার যোগাড় এখনই ক'রে দিচ্ছি ; তোমার স্ত্রী-পুত্র কোথায় ?

রমেশ বাহিরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ গাছতলায়।

কাছারীবাটীর নিকটস্থ একখানি খালিবাড়ীতে রমেশের সপরিবারে থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। রমেশ—জয়ন্তী ও সুকুমারকে আনিতে গেল।

রমেশ চলিয়া গেলে দারোগা বলিল—কিন্তু এতে কি কাজ হবে? মামলা ত খুনের ?

নৃত্যগোপাল পৈশাচিক হাসি হাসিয়া কহিল—আর ভাবনা কি—কাজ ত গুছিয়ে এনেছি। কামিনীর গহনাগুলো রাত্রে ওর ঘরে লুকিয়ে রেখে দেওয়া যাবে। তারপর ওর কাছথেকে গহনা বেরুলেই বোঝা যাবে—গহনার লোভে ও খুন করেছে।

হাসিতে হাসিতে দারোগা কহিল—আপনার বুদ্ধি দেখছি আমার চেয়ে খেলে।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে—প্রকৃতির শান্ত বক্ষে একটী

স্তব্ধ, ম্লান, অবসাদের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্লান্তদেহভার টানিতে টানিতে, ক্ষুধাতুর সুকুমারের অবসন্ন দেহখানি বক্ষে লইয়া, জয়ন্তীর হাত ধরিয়া রমেশ তাহার নূতন আশ্রয়ে উঠিল। নিয়তি আরও কোথায় লইয়া যাইবে—কে জানে?

৫

কাছারীগৃহের পশ্চিমপার্শ্ব দিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ চলিয়া গিয়াছে। স্থানটী দীর্ঘতরুরাজিসমাচ্ছন্ন। বৃহৎ অশ্বত্থ বট যেন জননীর স্নেহাঞ্চলের ন্যায় সঘন আবরণে চারিদিক্ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। নানাবর্ণের নানাপক্ষী তাহাদের আশ্রয়ে বাস করে। সর্ব্বদা বিহঙ্গকণ্ঠ মুখরিত হইয়া স্থানটী অতি রমণীয় হইয়াছে। প্রখর দিবালোক ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজির মধ্য দিয়া ভালরূপ প্রবেশ করিতে না পারায় দিবসেও পথটী যেন অন্ধকারময় হইয়া থাকে।

পল্লীপথ বক্রভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। খরস্রোতা নদী বর্ষায় দুকূল প্লাবিয়া বিরাট্ ধ্বংসের লীলা সৃজন করে, শীত ও গ্রীষ্মেও সর্ব্বদা জলভারে চঞ্চলা। রমেশ প্রায়ই নদীতীরে আসিয়া বসিত। দিনান্তের ক্লান্তরবি যখন রক্তোজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় শ্যামল বনভূমি প্রান্তর উপত্যকা নদীর তরঙ্গায়িত বক্ষখানি রঞ্জিত করিয়া লোহিতগরিমায় সুদূর মেঘরাজ্যে ছড়াইয়া পড়িত—তখন এক অব্যক্ত চিন্তা আসিয়া তাহার সমস্ত অন্তরটুকু অধিকার করিয়া বসিত। সে একদৃষ্টে দিগন্তে চাহিয়া

থাকিত। তাহার হৃদয়খানি শোকতপ্ত দুঃখময় অতীত জীবনের সকল চিন্তা ছাড়িয়া, বিশ্বের অস্তিত্ব ভুলিয়া, চলচঞ্চলা তটিনীর তরঙ্গের ন্যায় ঐ অসীম অনন্ত আকাশে ধাবিত হইয়া যেন কত সাধের, কত যত্নের, কত স্নেহের হারাণ রতনটুকু সাগ্রহে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া স্তব্ধ প্রকৃতিকে ম্লান আবরণে ঢাকিয়া দিত। তাহার চিন্তাস্রোত দমিত হইত। নৈরাশ্যের তপ্তশ্বাস —হৃদয়ের ব্যাকুলতার প্রতিমূর্ত্তিটুকু সেই শান্ত নদী-সৈকতে রাখিয়া সে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিত।

চক্রী নৃত্যগোপাল আপন দুরভিসন্ধি পূরণ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একদিন রমেশ গৃহের বাহির হইবার পর নৃত্যগোপাল তাহার সহিত দেখা করিবার ছল করিয়া তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। গৃহের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া মধুর মাতৃসম্বোধনে মনের সকল সন্দিগ্ধভাব বিদূরিত করিয়া নৃত্যগোপাল জয়ন্তীকে ডাকিয়া কহিল—"মা জয়ন্তী! রমেশ বাড়ী আছে?" রমেশ গৃহে নাই সে জানিত এবং সেই সুযোগ ধরিয়াই সে আজ তাহার দুরভিসন্ধি পূরণ করিতে আসিয়াছিল। রমেশের অনুপস্থিতির সংবাদ দিয়া জয়ন্তী সসম্ভ্রমে আশ্রয়দাতাকে বসিতে বলিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। রমেশ আসিয়া পড়িলে সব ব্যর্থ হইবে। কৌশলী নৃত্যগোপাল ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া কার্য্যনিবন্ধন অপেক্ষা করিবার অক্ষমতা জানাইয়া জয়ন্তীকে, রমেশকে তাহার কাছে পাঠাইয়া

দিতে বলিয়া যাইবার ভাণ করিল। সম্মুখে শিশুস্থকুমার দাঁড়াইয়াছিল। নৃত্যগোপাল তাহাকে আদর করিতে লাগিল, শেষে জয়ন্তীকে অন্যমনস্ক দেখিয়া স্থকুমারকে আদর করিতে করিতে বস্ত্রান্তরাল হইতে একটী ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া কক্ষের একটী গোপন স্থানে রাখিয়া জয়ন্তীর নিকট বিদায় লইয়া সত্বর গৃহের বাহির হইয়া গেল। বলা বাহুল্য খুব ধূর্ত্ততার সহিত নৃত্যগোপাল এ কার্য্য করিল।

সন্ধ্যাযোগে সেই অন্ধকারপথে রমেশ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। বাটীর নিকটে আসিয়া সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। নৃত্যগোপাল তখন গৃহের দ্বারে আঘাত করিতেছে। অন্ধকারে সে নৃত্যগোপালকে চিনিতে পারিল না। তাহার অনুপস্থিতিতে একজন পরপুরুষ বেশ পরিচিতের ন্যায় তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আবার যখন দেখিল জয়ন্তী দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল তখন রমেশের দেহে উষ্ণ রক্তস্রোতঃবহিতে লাগিল। একবার মনে করিল ছুটিয়া গিয়া এ ব্যাপারের প্রতিবিধান করিয়া আইসে; কিন্তু কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া দূর হইতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগোপাল যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার চলনভঙ্গিমা দেখিয়া রমেশ তাহাকে চিনিতে পারিল। হতভাগ্য একবার ভাবিল—"ওঃ! মানুষ এমন পিশাচ হইতে পারে। এই

জন্যই পাপিষ্ঠ তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে! যাক্—এ ত নূতন নয়; সে আজ কয় বৎসর ধরিয়া মানুষের কাছে প্রবঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু জয়ন্তী! দুশ্চারিণী পাপীয়সী—যাহার জন্য সে জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে—তাহার এই কুৎসিৎ ব্যাভিচার!” উন্মাদ আসিয়া হতভাগ্যকে আক্রমণ করিল। তাহার ইচ্ছা হইল আত্মহত্যা করিয়া সে সকল জ্বালার অবসান করে! পরক্ষণেই ভাবিল—“তাহা হইলে জয়ন্তীর শাস্তি দিবে কে?” কোন দিকে না চাহিয়া রক্তচক্ষে ভীমবেগে সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জয়ন্তী তখন রন্ধনে নিযুক্তা—সুকুমার কাছে বসিয়া নানা অর্থহীন বাক্যে মায়ের প্রাণ শীতল করিতেছিল। রমেশ ঘরে আসিয়াই কর্কশকণ্ঠে ডাকিল—“জয়ন্তী!” তাহার ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া জয়ন্তী কাঁপিয়া উঠিলেন। সুকুমার কাছে আসিয়া বলিল—“বাবা তুমি অমন কচ্চ কেন?” রমেশ সুকুমারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, ক্ষুধিত শার্দ্দুলের ন্যায় জয়ন্তীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল—“অবিশ্বাসিনী!” বজ্রাহতা নারী নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমেশ নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাকে প্রহার করিল। জয়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে শুদ্ধ বলিলেন—“আমায় মারছ?” রমেশ বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া বলিল—“চুপ—রাক্ষসী—পাপমুখে আবার কথা কইছিস্?” সুকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিল—“বাবা, তোমার পায়ে পড়ি—মাকে আর মেরো না!” রমেশ সে কথা কাণেও শুনিল না। সে

জয়ন্তীকে জোর করিয়া টানিতে টানিতে অন্ধকারপথে ঝটিকা-গতিতে নদীর দিকে ছুটিল।

নিশার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তরঙ্গিণী সফেন তরঙ্গভঙ্গে অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে। অন্ধকার—চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারে, সুপ্ত ধরণীর বক্ষে পৈশাচিক উল্লাস করিতে করিতে রমেশ তাহার প্রাণাধিকা পত্নীর প্রাণবধ করিবার জন্য উৎসুক। দুঃখিনী করুণ আর্ত্তনাদ সহকারে কহিতে লাগিল—"ওগো আমায় মেরো না—মেরো না।" রমেশ ধৈর্য্য-জ্ঞান-বুদ্ধি সব হারাইয়াছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত। শুধু বিকট প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল দাবানলের মত সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সে কোন কথা না শুনিয়া—কোন ভাবনা না ভাবিয়া—কোন দিকে না চাহিয়া সজোরে জয়ন্তীকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। মৃত্যুমুখী জয়ন্তীর ক্ষীণ দেহখানি একবার উপরে উঠিয়া পরক্ষণেই খরস্রোতে মিলাইয়া গেল।

জয়ন্তীকে মারিয়া কিয়ৎক্ষণ রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে উন্মত্তের মত সেই নদী সৈকতে বিচরণ করিতে লাগিল। সে স্পষ্ট শুনিল, জয়ন্তীর করুণ কণ্ঠ সেই নৈশ সমীরণের মধ্য হইতে: বলিতেছে—"ওগো আমায় মেরো না মেরো না! বায়ুবিক্ষিপ্ত বৃক্ষ পত্রগুলি মর্ম্মর ধ্বনি করিয়া যেন বলিতে লাগিল—আমায় মেরো না—মেরো না!" রমেশ জলের ধারে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

নৃত্যময়ী তটিনীর উচ্ছ্বসিত কোলাহলময় প্রতি তরঙ্গ হইতে যেন জয়ন্তীর ক্ষুব্ধ আত্মা জাগিয়া উঠিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন সহকারে কহিল—"আমায় মেরো না—মেরো না!" দুঃখে যন্ত্রণায় রমেশের দেহখানি সেইখানে লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ যে সে সেই নদীতটে অচেতনবৎ পড়িয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞান ছিল না। যখন তাহার চৈতন্য হইল তখন রাত্রি গভীর—নদীতে জোয়ার আসিয়াছে—অদূরস্থ বনমধ্যে শিবাকুল প্রহরজ্ঞাপক চীৎকার করিতেছে—মাথার উপর দিয়া কর্কশধ্বনি করিতে করিতে পেচক উড়িয়া যাইতেছে—পরপারে মহাশ্মশানে একটা জ্বলন্ত চিতা আগ্নেয়-অক্ষরে অন্ধকার-রাত্রে প্রহেলিকাময় মানবজীবনের নশ্বরতার নিশান উড়াইতেছে।

রমেশ ভাবিল—"কি করি—কোথায় যাই? ব্যাভিচারিণী জয়ন্তীর স্মৃতিপূর্ণ এ জ্বালাময় জীবন রাখিয়া লাভ কি? সম্মুখে গঙ্গা—ডুবিয়া মরি না কেন?" রমেশ নদীতে ঝম্প প্রদান করিতে গেল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—"ছি ছি, একি করিতেছি? পাপিনীর স্পর্শে গঙ্গা অপবিত্র হইয়াছে—এখানে ডুবিলে তাহাকে দেখিতে পাইব। হত্যা করিয়া যদি পাপ হইয়া থাকে সে পাপের দণ্ড অন্যরূপে গ্রহণ করিব।

৬

রমেশ আর কালবিলম্ব না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে ফাঁড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। দারোগা তখন দিব্যসুখে নিদ্রামগ্ন। জমাদার সাধু সিং একখানি গ্রন্থসাহেব হাতে করিয়া মিহিসুরে ভজন গাইতেছে; অতিরিক্ত অহিফেনসেবনহেতু শেষরাত্রি না হইলে তাহার চক্ষে নিদ্রা আইসে না। একটা বৃহৎ চালা-ঘরে পাঁচ সাত-খানা রশিরচিত খট্টাঙ্গে সাষ্টাঙ্গ সমর্পণ করিয়া পাঁচ সাত জন পাহারাওয়ালা, নদীর কল্লোল—শিবাকুলের সমতানধ্বনি—পেচকের কর্কশ চীৎকার একযোগে সকলকে পরাভূত করিয়া নাসিকায় দুন্দুভি-নিনাদ করিতে করিতে নগররক্ষায় নিযুক্ত!

রমেশ আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র জামাদারজী কহিল—"এত্তা রাতমে কোন্ হ্যায়রে?" পরে মনে মনে বিচার করিয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—"শালা আলবৎ চোট্টা হোগা, নেহিতো হিঁয়া কাহে আয়া?" গ্রন্থসাহেব রাখিয়া সে তাহার বৃহৎ বংশদণ্ড হাতে তুলিয়া লইল।

রমেশ বলিল—আমি খুনী!

সপ্তপ্রহরীর সমতানবাদ্য রমেশের ক্ষীণ কণ্ঠকে কোথায় ডুবাইয়া দিল। সাধুসিং উচ্চগলায় কহিল—জোরসে বোলো তোম কোন্ হ্যায়?

রমেশ উত্তর করিল—আমি খুনী—ধরা দিতে এসেছি!

অরণ্যে রোদন—কে কার কথা শুনে! এক সঙ্গে সাতটা জগ-ঝম্প বাজিতেছে—তার কাছে কি রমেশের কণ্ঠ দাঁড়াইতে পারে?

জামাদারজী উঠিয়া খড়ম জোড়াটী পায়ে দিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে বংশ-দণ্ডটী ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই রমেশ বলিল—জমাদারজী, আমি খুন ক'রেছি!

খুনের নাম শুনিবামাত্র সাধুসিং "ওয়াগুরু" "ওয়াগুরু" করি ত করিতে একলাফে চালা-ঘরে প্রবেশ করিয়া বংশদণ্ডের সাহায্যে বাদ্যকারদের জাগাইয়া বলিল—"সড়কী লেও ভাই—সরকী লেও—ডাকু আয়া হ্যায়!" ফাঁড়িতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। দারোগা বাবু উঠিলেন; কতকটা নিদ্রার ঘোর—কতকটা মদিরার ঘোর তাঁহার সহজ গতিকে বাধা দিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তিনি গৃহের বাহিরে আসিলেন। রমেশ ধরা দিল।

সেইরাত্রেই দারোগাবাবু নৃত্যগোপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নৃত্যগোপালের প্রসন্ন ভাগ্যে সুযোগের পর সুযোগ আপনি আসিয়া পড়িতেছে। কামিনীর অলঙ্কারগুলি রমেশের গৃহে রাখিয়া নৃত্যগোপাল ফিরিবার সময় রমেশকে দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসরণ করে। জয়ন্তীর নির্য্যাতন-ব্যাপারও সে গোপনে প্রত্যক্ষ করিয়া আইসে। তবে ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। রমেশ জয়ন্তীকে ধরিয়া লইয়া

গেল। গৃহে আর কেহ নাই—সুকুমার 'মা' 'মা' করিয়া করুণকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে। রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিল—তখনও রমেশ জয়ন্তীকে লইয়া ফিরিল না। অগত্যা নৃত্যগোপাল সুকুমারকে স্বগৃহে লইয়া গেল।

দারোগাবাবু ডাকিয়াছেন শুনিবামাত্র নৃত্যগোপাল ফাঁড়িতে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে বুঝিতে পারিল রমেশ সত্য সত্যই স্ত্রীহত্যা করিয়াছে। দারোগাবাবু ও নিত্যগোপাল অনেকক্ষণ গোপনে পরামর্শ করিল। ফলে রমেশ বেশ্যা-হত্যা ও স্ত্রীহত্যা উভয় অপরাধে অভিযুক্ত হইল। ধরা দিবার পর হইতে রমেশ আর কাহারো সহিত কোন কথা কহে নাই। শুধু হাকিমের নিকট জবানবন্দী দিবার সময় জোড়হাত করিয়া বলিল—হুজুর হত্যা করিয়াছি—যাতে শীঘ্র ফাঁসী হয় দয়া করিয়া তাহা করিবেন।

৭

ক্রোধের বশে হত্যা করিয়াছে বলিয়া বিচারে রমেশের ফাঁসী না হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। জজ সাহেব রায় দিবার পর রমেশ বলিল—"কই ফাঁসী ত হইল না—দ্বীপান্তরে গিয়াই খালাস পাইলাম!" হাকিম আসামীর কথা শুনিয়া মনে করিলেন—অনুতাপে লোকটা এরূপ বলিতেছে! দর্শকমণ্ডলীর অনেকে মনে করিল—কি ভীষণ দস্যু—ভয় নাই! কেহ কেহ ভাবিল—নিশ্চয় উন্মাদ!

দুঃখিনী সতী সাধ্বীকে হত্যা করিয়া শিশু সুকুমারকে পথে ফেলিয়া দিয়া রমেশ হাসিতে হাসিতে আণ্ডামানে চলিল! হুগলীর ঘাটে জাহাজে উঠিবার সময় রমেশ দেখিল, নদী তীরে একটা মড়ার মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। বিকট দৃশ্য নরকপাল—কূপ চক্ষু—নাসিকা-হীন—বিস্ফারিত মুখ—আকর্ণ বিস্তৃত দন্তপংক্তি! রমেশ কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া বিকট হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"একি একি, আমার পানে চাহিয়া ও অত হাসে কেন? নিশ্চয় ও সেই কলঙ্কিনী জয়ন্তীর মাথা! আমায় ঠাট্টা করিতে আসিয়াছে! পাপীয়সী, তোর চিহ্ন রেখে আমি যাব না!" রমেশ মাথাটা তুলিয়া লইয়া এক আঘাতে তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এইবার সুকুমারের কথা

মনে পড়িল—তখনই সে বলিল—কে সুকুমার? সে জয়ন্তীর কোলে উঠিত—সেই পাপীয়সীকে 'মা' বলিয়া ডাকিত—সে আমার শত্রু! তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই—সে মরুক!

নিশ্চিন্ত হইয়া রমেশ জাহাজে গিয়া উঠিল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পাঁচ দিন জাহাজে থাকিতে হইবে। রমেশ দেখিল, সেখানে আচার বিচার নাই—হিন্দু মুসলমান, মগ খৃষ্টান, হাড়ি মুচি সকলেই একসঙ্গে আহার করিতেছে, এক স্থানে শয়ন করিয়া আছে। প্রথম দিন উপবাসে গেল। পরদিন একজন পাঠান কর্ম্মচারী তাহাকে বলিল—"তোম ভুখা হ্যায় কাহে? যাও, চুড়া উড়া কুচ্ খা লেও!" রমেশ বলিল—"হাবিলদারজী—আমায় মাপ কর—বামুনের ছেলে—একটা জাত-ধর্ম্ম আছে ত? দেখছ না সব একাকার।" হাবিলদার সদর্পে উত্তর করিল—"কেয়া পাগলা কা মাফিক্ বোলতা! বদমাসিকা বখৎ তেরা জাত ধরম কাঁহা থা! যেসা বেমারি হ্যায়, দাওয়াই ভি উস্ মাফিক্ চাইয়ে! যাও, এই টিকিট দেখ্‌লায়কে জাহাজ কা ষ্টোর আফিসসে চুড়া লে আও!"

হাবিলদার রমেশের হাতে একখানি টিকিট দিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। টিকিটখানি হাতে করিয়া রমেশ ভাবিল—ঠিক কথাই বলেছে! আমার আবার জাত-ধর্ম্ম কি! যে, পাপিয়সী জয়ন্তীর হাতে এতদিন ভাত খেয়েছে সে জাত-ধর্ম্মের ভয় করে কেন?

ভাণ্ডারীর কাছে আসিয়া টিকিট দেখাইবামাত্র রমেশ কিঞ্চিৎ

আহার্য্য পাইল। আহার্য্য লইয়া ডেকের উপর আসিয়া রমেশ অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। খাইতে গিয়া সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—ছি ছি, একি করিতেছি? জয়ন্তী ব্যাভিচারিণী হইতে পারে, তা বলিয়া ভবেশচন্দ্রের ভাই মুসলমানের হাতে খায় কেন? যে পুণ্যশ্লোক দাদা আমার বদরিনারায়ণের বুকে বিশ্রাম করিতেছেন—তাঁর ভাই আজ মুসলমানের খানা খাইবে? ছি ছি!

রমেশ আহার্য্য সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। পরদিন সে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইল, তাহাকে যদি স্বতন্ত্র রাঁধিয়া খাইবার অনুমতি দেওয়া হয় তবেই সে আহার করিবে, নতুবা কিছুতেই সে খাইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ রমেশের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তাহার আর মরা হইল না। পঞ্চম দিবস প্রাতে রমেশচন্দ্র, সিন্ধু মাঝে বিন্দুবৎ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের "তমালতালিবনরাজিলীলা" বেলাভূমি দেখিতে পাইল। জাহাজের লোকে বলিল—ঐ কালাপানির কয়েদখানা!

তীরে জাহাজ লাগিল। একে একে বেড়ীপরা কয়েদীর দল সকলেই নামিল। ভাগ্যের তাড়নায় এইখানে রমেশচন্দ্র শেষ জীবনের বিশ্রামের জন্য আসিয়াছে। স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর; সমুদ্রতীরে বহুদূর ব্যাপিয়া সারি সারি শোভাময় নারিকেল বৃক্ষ। তাহারই মধ্যে ছোট ছোট এক একখানি সুদৃশ্য বাংলা। সৈকতসন্নিধানে সুবৃহৎ জেলখানা। চোর ডাকাত জালিয়াৎ হত্যাকারীতে সে স্থান পরিপূর্ণ। উত্তরে গহন বন—তথায়

হিংস্র জন্তুর ন্যায় অসভ্য আদিম নিবাসিগণ বিষাক্ত তীর বল্লম লইয়া সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে। সৌন্দর্য্যময়ের এমন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে কুৎসিৎ নরপশুর তাণ্ডব-নৃত্য—স্বভাবের প্রকৃতির সহিত মানুষের প্রকৃতির এখানে সামঞ্জস্য নাই। বৈপরীত্যের বিরাট্ অভিব্যক্তি!

রমেশ দেখিল, এখানেও জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া দুষ্কর। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই এখানে অধিক। পরস্পরের মধ্যে দলাদলির বড়ই প্রাদুর্ভাব। হজরৎ মহম্মদের নাম করিয়া মুসলমানগণ হিন্দুদের কলমা পড়াইয়া ইসলাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা বাড়াইতে চায়; হিন্দুগণ খোদাতালার নামে কর্ণে অঙ্গুলী প্রয়োগ করিয়া হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার জন্য মাথায় বিরাট্ "শিখা" রাখিতে আরম্ভ করে। প্রত্যুত্তরে মুসলমানেরাও দাড়ী বাড়াইতে থাকে। ফলে বড় বড় টিকি ও লম্বা লম্বা দাড়িতে আণ্ডামান পরিপূর্ণ। ক্ষৌরকারের উদ্দাম কুঠার যদি এই দাড়ী ও টিকি কর্ত্তনে নিযুক্ত হয় তবে বোধ হয় একটা ভীষণ কেশারণ্যের সৃষ্টি হইয়া পড়ে!

রমেশ গিয়া জেলের অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে নিজের আহার বিষয়ে আপত্তি জ্ঞাপন করায় অধ্যক্ষ সাহেব তাহাকে রন্ধনশালার কার্য্য দিলেন। রমেশ যেন বাঁচিয়া গেল। আর কিছু না হউক, জাত-ধর্ম্মটা রক্ষা হইল।

৮

ললিতমোহনের বেশ্যা-হত্যা-রহস্য, রমেশের দণ্ডের ব্যাপার, মানকরের কাহারও অবিদিত রহিল না। নৃত্যগোপালের উপর অনেকেই বিরক্ত ছিল; এই ঘটনার পর সকলেই হাড়ে হাড়ে চটিল। কিসে তাহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে সকলে তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। জমিদার ললিতমোহনের অবস্থা ভাল নয়। হত্যা করিবার পর হইতেই সে কিরূপ হইয়া গিয়াছে। অর্থবলে খুন চাপা পড়িল বটে কিন্তু মন তো চাপা পড়িবার নয়! মনে মনে সে দগ্ধ হইতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপে গেল। ললিতমোহন দেখিল মনের আর পরিবর্ত্তন হয় না। মন্ত্রী নৃত্যগোপাল তাহাকে বুঝাইয়া দিল, "সুরার মাত্রা বাড়াইয়া দাও—তোমার মনের কালি মুছিয়া যাইবে।" কথাটা ললিতের মনে লাগিল। সেইদিন হইতে সে সুরাকে তাহার আরাধ্যদেবী করিয়া তুলিল। ফলে অত্যল্পকাল মধ্যে 'কাল' আসিয়া তাহার দেহ, মন সবারই সৎকার করিয়া দিল।

ললিতমোহন অপুত্রক ছিল। তাহার কেহ ওয়ারিসনও ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল পতির সাধ্বী পত্নী পূর্ব্বাহ্নেই স্বর্গে গিয়াই বাঁচিয়াছিলেন। এক্ষণে বিষয় লইয়া গোল উঠিল। শেষে সরকার

বাহাদুর আসিয়া সমস্ত বিষয়ের ভার লইলেন। নৃত্যগোপালের অন্ন জল উঠিল। সরকার তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানকর ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন। ললিতমোহনকে বঞ্চনা করিয়া সে দুপয়সা সঞ্চয় করিয়াছিল; আদেশ অনুসারে পরদিনই সে সপরিবারে ত্রিবেণীতে আসিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য রমেশের-পুত্র সুকুমারকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে সঙ্গে আনিতে হইল।

নৃত্যগোপাল শত অপরাধে অপরাধী হইলেও সুকুমারকে, কি জানি কেন, একটু স্নেহের চক্ষে দেখিত। বোধ হয় সে বুঝিয়াছিল রমেশের সর্ব্বনাশ সেই করিয়াছে; তাহারই জন্য জয়ন্তীকে স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হইয়া অপঘাতে মরিতে হইয়াছে। তাহারই জন্য পত্নীগতপ্রাণ, পুত্রবৎসল, ধার্ম্মিক রমেশচন্দ্র হত্যাকারী! তাহারই জন্য আজ মা-বাপের নয়নের মণি হতভাগ্য সুকুমার চির অনাথ, পথের ভিখারী!

সাতবৎসর বয়সে সুকুমার একরূপ পিতৃমাতৃহীন হইল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে; সে কি এই নিদারুণ শোক ভুলিতে পারে? সহসা মা হারাইয়া সুকুমার পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিল। হত-ভাগ্যকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই—দুই দিন অনাহারে পড়িয়া রহিল—কেহ খোঁজও লইল না। যে অন্ধকার গৃহে দুখের গোপাল পড়িয়াছিল, দুই একবার নৃত্যগোপাল সেখানে আসিল। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীর নিনাদে প্রচণ্ডা সহধর্ম্মিণী স্বামীকে তিরস্কার

করিয়া বলিল—"নিজের চরকায় তেল দাও গে!" পরে কর্কশকণ্ঠে সুকুমারকে বলিল—ওরে ছোঁড়া, উঠে খেগে না—ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে দিনরাত চরকা কাটা—ওকি ও? মিনসে এত আপদ্‌ও যোটোতে পারে?

নৃত্যগোপাল পিশাচপ্রকৃতি—তার অসাধ্য কাজ নেই; ছল-বল কৌশল শঠতা প্রবঞ্চনায় সে অদ্বিতীয়; কিন্তু পত্নী বিরাজমোহিনীর কাছে কথা কহিবার তাহার সাধ্য নাই। কোন্ মন্ত্রে বিরাজ এই কাল-সাপকে এমন বশীভূত করিয়াছে তাহা বোধশক্তির অতীত। এই পর্য্যন্ত জানা আছে, বিরাজ দ্বিতীয়পক্ষের গৃহিণী; বয়স কাঁচা—পঁচিশের ঊর্দ্ধ নয়, বেশ ফিট্‌ফাট্, প্রত্যহ আল্‌তা পরে, দাঁতে মিশি দেয়, দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার আয়নার সম্মুখে গিয়া ঠোঁট দুটি তাম্বুলের রাগে বেশ টুকটুকে আছে কি না দেখিয়া আসে, মুখে সর ময়দা মাখে, মিহি শান্তিপুরে বা নীলাম্বরী শাড়ী পরে। সে পল্লীর বধূদের ন্যায় শীতলা ঠাকুরুণের মত ধ্যাবড়া সিঁদুর পরে না—কাঠির বা চিরুণীর ডগায় করিয়া সিঁথির উপর একটু সরুরেখা টানিয়া দেয়—সুবিধা পাইলেই খোঁপায় গোলাপ চাঁপা বা বেল ফুল গুঁজে! তার উপর হাতে ডায়মনকাটা অনন্ত—নীচে হাতে চুড়ী, বালা—গলার হার—কোমরে রূপার গোট—কাণে দুল—নাকে হীরা বসান নাকছাবি—পায়ে মল! গৃহস্থ-ঘরের বৌ-ঝির এরূপ সাজ-সজ্জা তখনকার কালে ছিল না। কাজেই প্রতিবেশিনীগণের বৈঠকে বিরাজ একটা

সমালোচনার পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। বিরাজ কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না! নৃত্যগোপালেরও সাধ্য নাই যে পত্নীর চাল চলন রং ঢংএর কোন প্রতিবাদ করে। নৃত্যগোপালের বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। শরীর ভাল নয়—সম্প্রতি মনও খারাপ। একটা নিরীহ পশুকে খাইয়া কালসাপ যেমন জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে—রমেশের সর্ব্বনাশ করিয়া নৃত্যগোপালের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। নৃত্যগোপালকে কেউ কখন চোখের জল ফেলিতে দেখে নাই; তাহাকে কেউ কখন "আহা" বলিতে শুনে নাই। সুকুমারের কষ্ট দেখিয়া জীবনে সে এই প্রথম "আহা" বলিল— তাহার কুঞ্চিত গণ্ডদেশে শুকনা জলের দাগ দেখা গেল! পত্নীকে হাজার লুকাইলেও চতুরা বিরাজ স্বামীর সুকুমারের প্রতি লুক্কায়িত অনুরাগ বেশ অনুভব করিল। ফলে ভাগ্যহীন সুকুমারের প্রতি অধিকতর নির্য্যাতন হইতে লাগিল। বিরাজের স্বর শুনিলে শিশু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। তাহার ভয়ে সে একদিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেও পাইত না। জগদীশ্বর জীবকে যেমন দুঃখ দেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে তেমনি সহ্য করিবার শক্তিও দিয়া থাকেন। নতুবা মা বাপ গেল—তিন কুল অন্ধকার—সাত বৎসরের বালক এক মুঠা অন্নের জন্য পরগৃহে এত পীড়ন কখনই সহ্য করিতে পারিত না।

৯

কাল কারো মুখ চাহে না—সে শুধু অবিরাম চলিয়া যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—কালের কোলে ভাসিয়া গেল। ক্ষুদ্র শিশু মায়ের কোলটি ছাড়া বিশ্বের আর কিছুই জানিত না; সে আজ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—পৃথিবী চিনিয়াছে—আত্মপর বুঝিয়াছে। এমনি করিয়া কাল কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতেছে। কালের নিয়ম লঙ্ঘন করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত রমেশচন্দ্রের দিন কাটিতে লাগিল।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, রমেশচন্দ্র জেলখানায়। এই সময় এমন একটী ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার ফলে রমেশচন্দ্রের দণ্ড হ্রাস হইয়া যায়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোম্পানীর "খয়ের-খাঁ" হইবার জন্য তিনি কয়েদীদিগকে পশুর অধম করিয়া খাটাইতেন এবং নির্য্যাতন করিতেন। এই সূত্রে হিন্দু মুসলমান মগ প্রভৃতি কয়েদীরা বিদ্রোহী হইবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। রন্ধনাদি সমাপন করিয়া রমেশ আসিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া আছে; অদূরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কয়েদীদিগের সহিত বচসা করিতেছেন।

কয়েদীরা বলিতেছে, তাহারা ঘানি টানিবে না; সাহেবও শুনিবার পাত্র নন। সামান্য বচনা হইতে ক্রমে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এক যোগে কয়েদীরা সাহেবকে গিয়া অক্রেমণ করিল। নিকটে হাবিলদার প্রহরী কেহই ছিল না। সাহেব প্রমাদ গণিলেন। রমেশ দেখিল সাহেব যায়। এক লাফে সে গিয়া সাহেবকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইল। কয়েদীদের লাঠি সোঁটা তাহারই উপর পড়িতে লাগিল। রমেশের মাথা ফাটিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইল, তথাপি সে সাহেবকে ছাড়িল না। গোলমালে প্রহরিগণ ছুটিয়া আসিয়া বিদ্রোহীদের দমন করিল। রমেশ তখন মূৰ্চ্ছিত। সাহেব অক্ষতদেহে দেখিলেন তাঁহার প্রাণদাতা সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিজে সেই রুধিরাক্ত দেহ কোলে করিয়া হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলেন। যথা-রীতি চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা হইল। রমেশের সুস্থ হইতে প্রায় তিন মাস লাগিল। বলা বাহুল্য—কৃতজ্ঞ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব রমেশের পরিচর্য্যার জন্য বঙ্গদেশীয় একজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া দেন। দয়াপরবশ হইয়া সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকট রমেশের সাহস ও আচরণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া তাহার দণ্ড হ্রাসের প্রার্থনা করিলেন। যথাকালে সরকার বাহাদুর জানাইলেন, সাত বৎসর পূর্ণ হইলেই রমেশ মুক্ত হইবে এবং অতঃপর জেল-খানার বাহিরে সে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিবে। পুরাতন কয়েদিগণ বহুকাল সচ্চরিত্র হইয়া কালাপানির জেল-

থানায় থাকিলে অনেক সময় তাহাদিগকে বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাহিরে তাহারা চাষ করিয়া দিনযাপন করিবার জন্য কিঞ্চিৎ জমি পাইয়া থা কে। ইচ্ছা করিলে তাহারা সহধর্ম্মিণীও লাভ করিতে পারে। সাহেব রমেশকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছোট একখানি বাংলা দেখাইয়া বলিলেন—টুমি এইখানে ফুর্ত্তি করে থাক্‌বে। হামি বল্‌ছে একটা সাদি বি করবে। খুবসুরৎ একটা জেনানা আসামী হামি বার কর্‌বে।

রমেশ সেলাম করিয়া সাহেবকে বলিল—"না সাহেব, আমার সাদির সাধ মিটে গেছে। একলা আছি—বেশ আছি।" সাহেব হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

আবার সাদি! অদৃষ্টের কি পরিহাস! ধূসর সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে, দিগন্তহীন বারিধির জনহীন সৈকতভূমে বসিয়া কঠিন-হৃদয় রমেশের চক্ষু জলভারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহহীনের গৃহ, ভাগ্যহীনের ভাগ্য— এ সকল কি গিয়া আবার ফিরিয়া আসে? মানুষ মরিয়া গেলে আবার কি তাহাকে পাওয়া যায়? সহসা দূরে, যেখানে মহাসাগর মহাকাশকে আলিঙ্গন করিয়াছে, সেই মিলনকেন্দ্রের মধ্য হইতে চন্দ্র উদিত হইয়া রমেশকে দেখিতে লাগিল। রমেশ ভাবিল, বুঝি ও মুখ কোথায় দেখিয়াছে; মানসনেত্রে সে দেখিল, সুকুমার হাসিতেছে! সম্মুখে বেলাভূমে সফেন তরঙ্গ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; বিস্তীর্ণ বসুন্ধরা, সাগরাম্বর সব ভুলিয়া রমেশের মনে

হইল—জয়ন্তী তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে! তাহার দুই চক্ষে বসুধারা ছুটিল। মূর্খ রমেশ, ভুলিয়াও ভুলিতে পারিলে না! জেলখানায় বেশ ছিলে; লোহার বেড়ি খুলিয়া আবার একি বিষম বেড়ি পড়িতেছ!

১০

জয়ন্তীর মৃত্যুর পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অনাথনাথের বয়স এখন চতুর্দ্দশ বৎসর। তাহার বড় কষ্ট; পিঠের শিরদাঁড়া উঠিয়া পড়িয়াছে; বুকের পাঁজরগুলি দেখা যাইতেছে; তৈলাভাবে রুক্ষকেশ; শতচ্ছিন্ন বস্ত্র ভিন্ন এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে কখন নূতন বস্ত্র পরিতে পায় নাই। সাত বৎসরে সাত বার শরৎকালে মা দুর্গা এই বঙ্গভূমে আসিয়াছেন। মায়ের আগমনে ঘরে ঘরে আনন্দ কল্লোল—আবালবৃদ্ধবনিতার নূতন বেশ—চতুর্দ্দিকে উৎসবের বাজনা – পূজা-বাড়ীতে চব্যচষ্যের প্রাচুর্য্য—ধনী দরিদ্র, ছোট বড়, শত্রু মিত্র—সকলের শুভ সম্মিলন। কোথাও কিছুরই অভাব ছিল না। শুধু অনাথ বালক অনাথনাথের শুষ্ক বিরস মুখখানিতে কখনও আনন্দের রেখাটুকুও ফুটিয়া উঠে নাই—সে কখনও নব বস্ত্র পরিধান করিয়া মা দশভুজার কাছে যাইতে পারে নাই। একবার ত্রিবেণীর রায়বাবুর বাড়ীর কর্ত্তা মহাশয় জীর্ণবেশ শুষ্কমুখ অনাথকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিয়াছিলেন। অনাথ বিরাজমোহিনীকে মা বলিয়া ডাকিত। বাড়ীতে আসিয়া সে আহ্লাদ করিয়া বলিল—"মা, রায়বাবুরা আমাকে

এই কাপড়খানি দিয়াছেন।” বিরাজ ভ্রূকুটীপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ কাপড়খানি কাড়িয়া লইয়া বলিল—“হারামজাদা ছোঁড়া, এখানে কাঁড়ি গিল্‌বি, আর এই রকম ক'রে আমাদের নাম ডুবাচ্চিস্? শেষ কি না দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে!” কাঁদিতে কাঁদিতে অনাথ বলিল—“আমি ত ভিক্ষা চাইনি—তাঁরা দয়া ক'রে দিয়েছেন।” বিরাজ বালকের গালে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—“তোর মিথ্যে কথা!” পাশের ঘর হইতে ক্ষীণতীব্র-স্বরে কে বলিল—“আহা ছেলেটাকে আর মেরোনাগো, হয়তো তাঁরা দয়া ক'রেই দিয়েছেন।” “তোমারও কাঁথায় আগুন—তাঁদেরও কাঁথায় আগুন—তাঁদের দয়ারও কাঁথায় আগুন” বলিতে বলিতে ঘরখানা কাঁপাইয়া বিরাজ অন্যত্র চলিয়া গেল। সেদিন অনাথের ভাগ্যে আর অন্ন জুটিল না। শারদীয়া মহাষ্টমীর দিন মহামায়ার করুণাপ্রার্থী—অনাথ বালকের অশ্রুজল কেহ আসিয়া মুছাইয়া দিল না!

নৃত্যগোপাল অনাথকে ভালবাসিলেও কখনও তাহার সাক্ষাৎ পাইত না। সাম্রাজ্ঞীর আদেশে সে গৃহে অনাথনাথের প্রবেশ নিষেধ ছিল। ত্রিবেণীতে আসিবার অব্যবহিত পরেই নৃত্যগোপাল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। সাত বৎসর সে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে। এখন অবস্থা সঙ্কট—বিরাজ যদি দয়া করিয়া এক মুঠা অন্ন তাহাকে দেয় তবেই সে খাইতে পায়।

অনাথ দশ বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে বিরাজ পদ্ম'র মা

এবং কেদার সর্দ্দারকে জবাব দিল। পদ্ম'র মা কাপড় কাচা, বাসন-মাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিত এবং কেদার প্রত্যহ বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত। সেই কাজের ভার অনাথের ঘাড়ে পড়িল। কয়খানি হাড় লইয়া প্রাণভয়ে বাছা দুই তিন বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ এই কাজ করিতেছে। এত করিয়াও কিন্তু তাহার নিস্তার নাই। সামান্য ক্রুটী হইলেই ভাত বন্ধ, নির্য্যাতন, প্রহার ইত্যাদি।

নৃত্যগোপালের আসন্নকাল যত সন্নিকট হইয়া আসিতেছে গৃহিণীর তেজ, দর্প, অত্যাচার ততই বাড়িতেছে। দীর্ঘ রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া নৃত্যগোপালের মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। সে এখন ভগবানের নাম করে, উঠিতে বসিতে বলে "দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!" এক একবার যোড়হস্তে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে সে অশ্রু মোচন করে। পত্নীর সহস্র প্রতিবাদ না শুনিয়াও সম্প্রতি সে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। উক্ত কার্য্যে পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্মপত্নী আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য একমাস কাল স্বামীর অর্দ্ধাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিল!

১১

সাত বৎসর পূর্ণ হইলে একদিন প্রাতঃকালে সুপারিটেণ্ডেণ্ট সাহেব রমেশকে আসিয়া বলিল—আজ হইতে তুমি মুক্ত হইলে; এখানে আর তোমায় থাকিতে হইবে না; ঐ তীরে জাহাজ লাগিয়াছে; ঐ জাহাজে তুমি আপনার সাধের জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন কর; আমি তোমার দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বচ্ছন্দ প্রার্থনা করি!

রমেশ সাহেবকে পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া শত শত ধন্যবাদ দিল। সাহেব তাহার সহিত করমর্দ্দনপূর্ব্বক ছল ছল নেত্রে কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। সাহেব চলিয়া গেলে রমেশ ভাবিতে লাগিল—সাধের জন্মভূমি—সুখ-স্বচ্ছন্দ দীর্ঘজীবন লাভ! সাহেব কি আমায় পুরস্কার দিল, না তিরস্কার করিয়া গেল? জয়ন্তী নাই—ননীর পুতলী সুকুমার কোথায় কে জানে? তাকে আর কোথায় পাইব! হয়ত তার ক্ষুদ্র অস্থিগুলি হিম রৌদ্রে কোথায় পড়িয়া আছে, নয়ত চিতাভস্ম কোন শ্মশানমৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাই যদি হয়—যদি পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া সে দেহের একখণ্ড অস্থি অথবা বিন্দুমাত্র ধূলিকণা বাহির করিতে পারি, তবে

আমি ধন্য! নিশ্চয়—নিশ্চয়—আমায় দেখিয়া সেই ধূলিও "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিবে! ডাকো ডাকো—যাদু—তেমনি করিয়া "বাবা" বলিয়া ডাকো! আমার শ্রবণ চরিতার্থ হউক!

নারিকেল বৃক্ষতলে ধ্যাননেত্রে ভাবে বিভোর হইয়া রমেশ বসিয়া রহিল। প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে গলিত সুবর্ণরাশি ছড়াইয়া দিল। কাণের কাছে শান্ত সমুদ্র সুমধুর কল্লোলে সমীরণকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। রমেশ ভাবিল—সুকুমার আধ আধ স্বরে তাহারই সঙ্গে কথা কহিতেছে!

কতক্ষণ এইভাবে গেল। জাহাজের বাঁশি বাজিল। রমেশ কালাপানির কয়েদখানার কাছে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

১২

গভীর রাত্রি। এইমাত্র খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিতেছে; নদীতীরস্থ মহাশ্মশানে একটী ১০।১২ বৎসরের বালকের চিতা জ্বলিতেছিল; অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে চিতা নিভিয়া গেল। শববাহকেরা নিকটে একটা বৃক্ষতলে বসিয়া তামাক সেবন ও কথোপকথন করিতেছে। দূরে—অন্ধকারে একটা ঝোপের আড়াল হইতে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ একদৃষ্টে সেই চিতার প্রতি দেখিতেছে।

কথোপকথনকারীদিগের মধ্যে একজন বলিল—ওহে, চিতা ত নিভে গেল—এ রাত্রে আবার কাঠ কোথায় পাওয়া যায়?

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল—"পাগল না কি—আবার কাঠ নিয়ে আসবে? চল—চল—বাড়ী পালাই, দেখছ না—আকাশ ঝুঁকে আসছে; এখনই জোয়ার এলে মড়া, চিতা সব ভেসে যাবে।" প্রথম ব্যক্তি তাহার কথা অনুমোদন করিয়া বলিল—"ঠিক্ বলেছ—সেই ভাল—চল যাই।" সকলে উঠিল। হঠাৎ ঝোপের দিকে একজনের দৃষ্টি পড়িল। অন্ধকারে বিকটাকার মনুষ্যমূর্ত্তি

দেখিয়া ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। স্বভাবতঃ সে ভীরু; তাহাতে আবার ঐ বিভীষিকা দেখিয়া সে মনে করিল, ভূতের হাতে পড়িয়াছে! ঝোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চীৎকার করিয়া সে সঙ্গীদিগকে বলিল—দেখ্‌চিস্‌ কি, নিশ্চয় সুকুমার ভূত হয়েছে; পালা—পালা!

তিনজনে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যে বালকের শব সৎকার করিতে আসিয়াছিল তাহার নাম সুকুমার!

শববাহকেরা প্রস্থান করিলে পর পাগলের ন্যায় সেই দীর্ঘাকার পুরুষ ছুটিয়া আসিয়া—"সুকুমার! সে যে আমার সুকুমার! তোমরা তার কে?" বলিতে বলিতে পলায়নকারীদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। নেপথ্যে শুনা গেল—"ও বাবা গো! ঐ বুঝি ধরলে!" মুহূর্ত্তমধ্যে শববাহকগণ অন্ধকারে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল। কিয়ৎক্ষণ ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর দীর্ঘাকার পুরুষ ফিরিয়া আসিয়া সেই চিতার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পাঠকের বোধ হয় বুঝিতে বাকি নাই, আগন্তুক আমাদের রমেশচন্দ্র। সম্প্রতি আণ্ডামান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে সুকুমারের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে! হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, দশ বার বৎসরের ছেলে দেখিলেই তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—"হাঁ বাবা, তোমার নাম কি সুকুমার?" গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া অনুসন্ধান করে, সুকুমার নামে একটী ছেলেকে কেহ জানে বা দেখিয়াছে

কি না? রমেশের অন্য কোন কর্ম্ম নাই। সম্প্রতি মানকরে গিয়া কোন সন্ধান পাইল না। সেখান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিতেছিল। পথে এই ব্যাপার ঘটিল। শববাহকের মুখে 'সুকুমার' নাম শুনিয়াই সে মনে করিল নিশ্চয় তাহারই সুকুমার। রমেশের বিশ্বাস তাহার পুত্র ছাড়া 'সুকুমার' নাম পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। হতভাগ্য তাই সুকুমার মরিয়াছে শুনিয়া পুত্রশোকে বিহ্বল হইল। মনে মনে যুক্তি করিয়া দেখিল—সম্মুখের চিতায় তাহারই সুকুমার শুইয়া আছে। শববাহকেরা মৃতের কেহ নহে। আপনার জন হইলে কখনই তাহারা অর্দ্ধ-দগ্ধ শবদেহ শ্মশানে ফেলিয়া যাইতে পারিত না। তা'ছাড়া যাহারা আসিয়াছিল তাহারা দিব্য হাস্যামোদ করিতেছিল। কেনই বা করিবে না—রমেশের ছেলে সুকুমার তাহাদের কে? শুধু গলগ্রহ বইত নয়! আর তাদের অন্ন নষ্ট হইবে না—তাহারা বাঁচিল!

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রমেশ কাঁদিতে লাগিল। শেষ রাত্রে জোয়ার আসিয়া শ্মশানভূমি জলে পরিপূর্ণ করিল। স্রোতের তাড়নায় চিতাসমেত সেই অর্দ্ধ-দগ্ধ শবদেহ কোথায় ভাসিয়া গেল! হতভাগ্য শূন্যমনে সেইখানে বসিয়া রহিল।

১৩

জঙ্গলের পথে একটী বালক কাঠের বোঝা কাঁধে করিয়া আসিতেছে। বালকের অঙ্গ ধুলি-ধুসরিত—পরিধানে বস্ত্র নাই বলিলেও হয়—কাঁধে, পিঠে দুর্গন্ধ-পূর্ণ ক্ষত—ভারি বোঝা লইয়া বালক অতি-কষ্টে যাইতেছিল। একবার বসে, আবার দুই পা অগ্রসর হয়; বোঝাটি নামাইবার সময় কাতরভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—"বাবাগো, তুমি কোথায়? মাগো, আর যে পারি না!" একটু বসিয়াই চারিধারে চাহিয়া, যেই দেখে বেলা বাড়িতেছে অমনই সে ভয়ে ভয়ে বোঝাটি লইয়া দ্রুতগতিতে যাইতে চেষ্টা করে। এইরূপে হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হতভাগ্য বালক গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দীর্ঘ-শ্মশ্রুধারী এক বলিষ্ঠ পুরুষ অনেকক্ষণ ধরিয়া বালকটীকে দেখিতেছিল। পথিকের উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষ, সুদৃঢ় মাংসপেশী। তাহার পরিধানে কৌপীন, অঙ্গে একটা জীর্ণ নীলবর্ণের আঙ্‌রাখা, স্কন্ধে একটা দ্রব্যপূর্ণ বৃহৎ ঝুলি, তদুপরি একখানি কম্বল; দক্ষিণ হস্তে বংশের যষ্টি। পথিক দ্রুত আসিতেছিল। ক্লিষ্ট বালককে দেখিয়া সে গতি সংযত করিল; ক্রমে বালকের সঙ্গ লইল। একস্থানে বালক যখন বোঝাটি নামাইয়া বসিল, পথিকও

তাহার নিকটে আসিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি বাবা ?

বালক। অনাথনাথ।

পথিক। তোমার কি মা-বাপ নেই ?

বালক। না।

পথিক ভাবিল—"আহা! ছেলেটীর কেউ নাই! আজ যদি ওর মা-বাপ থাকিত তা'হলে কি ও এত কষ্ট পায়!" বোঝার ঘর্ষণে বালকের পিঠ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল; পথিক স্বীয় আঙ্ রাখা ছিঁড়িয়া সযত্নে ক্ষতস্থান মুছিয়া দিল। পরে তাহার শীর্ণ দেহখানিতে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল। বালক বলিল, "এইবার আমি যাই। আপনি যদি একটু দয়া করিয়া এই বোঝাটি আমার পিঠে তুলিয়া দেন ?"

পথিক। কোথায় যাবে বাবা ?

বালক। আর বেশী দূর নয়, আমি যাঁদের কাছে কাজ করি সেইখানে যাইব।

পথিক। কোথায় তুমি কাজ কর ?

বালক। বামুনবাড়ী।

পথিক। তোমার পিঠময় ঘা হইয়াছে, শরীরেও পদার্থ নেই, এর উপরও তোমাকে এই সব কাজ করিতে হয় ? তারা কেমন মনিব, তাদের কি দয়া মায়া নেই ?

বালক সে কথার আর উত্তর দিল না। শুধু তার চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শেষে জিহ্বাদ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠদুটী কিঞ্চিৎ সিক্ত করিয়া বলিল—অনেক বেলা হইয়াছে আর দেরী করিলে গিন্নি মা মারিবেন ; আপনি বোঝাটী তুলিয়া দিন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রমেশ ভাবিল—"ভগবান্ একি ! সে নারী—না রাক্ষসী ! বিচিত্রই বা কি ! আমার অদৃষ্টে কি না ঘটিল ! কিন্তু ছেলেটীকে কি করে রক্ষা করি ?" পথিকের সুন্দর ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বালককে বলিল—চল, আমি তোমার কাঠের বোঝা দিয়া আসি। তুমি পারিবে কেন বাবা ?

অনাথনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। এমন মিষ্টকথা সে কখনও শুনে নাই। এত দয়া, এত স্নেহ, এত সহানুভূতি সে কখনও কাহারও কাছে পায় নাই ! সে পথিকের বুকে মাথাটী রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালকের অশ্রুর সহিত প্রৌঢ়ের অশ্রু মিশিল—পথিক সেই শীর্ণ গণ্ডদেশে একটী চুম্বন করিল। দুইটী অপরিচিত প্রাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে এক হইয়া গেল।

পথিক কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া লইল, বালকের কোন আপত্তি শুনিল না। অল্পক্ষণ মধ্যে তাহারা নৃত্যগোপালের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালক তখন বলিল—"গিন্নিমা যদি দেখেন আপনি আমার কাঠের বোঝা বহিতেছেন তবে তিনি আমায় অত্যন্ত প্রহার

করিবেন। এইবারে কাঠের ভার আমার পিঠে চাপাইয়া দিন!" রমেশ তাহাই করিল। বালক গৃহে প্রবেশ করিবার পর অনেক-ক্ষণ পথিক বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। বিলম্ব হওয়ায় বালকের প্রতি বিরাজমোহিনীর তিরস্কার বাক্য বাহিরে পথিকের প্রাণে শেল সম বিঁধিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পথিক স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। পথিক আর কেহ নহে, হতভাগ্য রমেশ।

১৪

অনাথনাথের জন্য প্রত্যহ রমেশ প্রত্যূষে জঙ্গলে আসিয়া কাঠ কাটিয়া রাখে। সে সঙ্গে কিছু আহার্য্যও লইয়া আইসে। বালক আসিবামাত্র তাহাকে বেশ করিয়া খাওয়ায়। পরে নিজে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া বালককে সঙ্গে লইয়া নৃত্যগোপালের গৃহে দিয়া আইসে। দ্বিপ্রহরে সে পুকুর ঘাটে বসিয়া থাকে। অনাথ যখন বাসন মাজিতে যায়—রমেশ তখন তাহার কাজ করিয়া দেয়। পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া, রীতিমত বিশ্রাম লাভ করিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে বালকের শ্রী ফিরিল। বিরাজ দেখিল অনাথ যায় আর কাঠ আনে—বাহিরের কোন কাজে তার আর বিলম্ব হয় না—এদিকে সে বাড়ীতেও আর বড় খায় না অথচ শরীরে লাবণ্য হইতেছে। একদিন সে লক্ষ্য করিল, অপর এক ব্যক্তি তাহার বাসন মাজিয়া দিতেছে। দ্বিতীয় দিন রমেশের মাথায় কাঠের বোঝা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। আর একদিন দেখিল সেই ব্যক্তিই ঘাটের ধারে বসিয়া অনাথকে আদর করিয়া ভাল ভাল খাবার খাওয়াইতেছে। সেইদিনই বিরাজ অনাথকে সেই অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বালক বলিল—"একজন লোক আমায় বড় দয়া করেন—

তিনি কে আমি জানি না।" বিরাজ বালকের কথায় বিশ্বাস করিল না; তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। নৃত্যগোপালের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়—আসন্নকাল সন্নিকট। গৃহিণীর নিকট সকল কথা শুনিয়া তাহার মনে কেমন একটা সন্দেহ আসিল। সে বলিল—অনাথকে বলিও, সে যেন সেই লোককে আমার কাছে লইয়া আইসে। বিরাজ চলিয়া গেলে নৃত্যগোপালের মনে একটু আহ্লাদ হইল। সে মনে মনে বলিল—আহা, ছেলেটী আমার কাছে থাকিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে—তাকে যে স্নেহ করে ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন!

সেইরাত্রিই নৃত্যগোপালের পীড়ার বৃদ্ধি হইল। ত্রিবেণীর বৈদ্য আসিয়া বলিলেন—"অবস্থা কঠিন, দুই একদিনের মধ্যেই প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা।" বৈদ্যের কথা শুনিয়া বিরাজ মোহিনী রোগীর শয্যাদি সরাইয়া লইয়া তক্তার উপর একখানি চেটাই বিছাইয়া স্বামীর শেষের সম্বল করিয়া দিলেন! সেইদিনই অনাথনাথের সঙ্গে রমেশ নৃত্যগোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নৃত্যগোপালের তখন শেষ অবস্থা; এক একবার চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেছে; পরক্ষণেই সে প্রলাপ বলিতেছে। রমেশ আসিয়া যখন তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল তখন তাহার জ্ঞান নাই। সে আপনা আপনি বলিতেছে—ঐ—ঐ আমারই জন্য রৌরব, কুম্ভীপাক মুখব্যাদন করিয়া আছে! হায় হায় কি করিলাম!

আমারই জন্য রমেশচন্দ্র নিরপরাধ সতী সাবিত্রী সহধর্ম্মিণীকে হত্যা করিল—আমারই জন্য অনাথের এত কষ্ট! কোথায় রমেশ, এসো—তোমার পুত্রকে নিয়ে যাও!

রমেশের মুখে বাক্য নাই—চক্ষে পলক নাই—দেহে স্পন্দন নাই! অদ্বিতীয় শিল্পীর নিপুণ হস্তের রচিত মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া আছে। কতক্ষণ পরে তাহার মনে হইল কে যেন 'রমেশ' বলিয়া ডাকিতেছে—কে যেন তাহার জয়ন্তী সুকুমারের কথা কহিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মুমূর্ষু কাতরকণ্ঠে কহিল—আমায় মার্জ্জনা কর রমেশ!

ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ যেমন পথিককে পথ দেখাইয়া দেয়—মরুভূমে মরীচিকাভ্রান্ত পর্য্যটক বারিসন্দর্শনে যেরূপ আনন্দ লাভ করে—মুমূর্ষুর আহ্বানে রমেশের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। আবেগের সহিত সে বলিল—কে—কে ডাকে? হতভাগ্যকে ত এদেশে কেউ চেনে না! স্ত্রীহত্যাকারী, চিরনির্ব্বাসন-দণ্ডে-দণ্ডিত এই ঘৃণ্য কুক্কুরকে কে ডাকে!

নৃত্যগোপাল চাহিয়া দেখিল, চিনিল সম্মুখে রমেশচন্দ্র! সে জড়িত জিহ্বায় বলিতে লাগিল—রমেশ এসেছ—ক্ষমা কর, ভাই—মহাপাতকীকে ক্ষমা কর! তোমায় খুনী বলিয়া ধরাইয়া দিব বলিয়া রাত্রিতে আমি নিহত বেশ্যার অলঙ্কারাদি তোমার স্ত্রীর ঘরে রাখিতে গিয়াছিলাম। তুমি না বুঝিয়া সেই সতী সাধ্বীকে অবিশ্বাসিনী

মনে করিয়া হত্যা করিয়াছিলে! আমি ওরূপ মহাপাতকে প্রবৃত্ত না হইলে কখন তুমি জ্যোৎস্নার শুভ্রতাকে সন্দেহ করিতে না! এখন আমি চলিলাম—আমায় তুমি মার্জ্জনা কর! আর ঐ—ঐ, তোমারই পুত্র অনাথনাথ! আমি ওর . নাম জানিতাম না; অনাথ হইল বলিয়া অনাথনাথ বলিয়া ডাকিতাম। অনাথকে কোলে কর ভাই!

সুকুমার "বাবা—বাবা" বলিয়া পিতাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। রমেশের তখন সংজ্ঞা নাই। নৃত্যগোপাল আর কথা কহিল না—অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয় চিরশান্তি-ধামে চলিয়া গেল।

—

১৫

সেই মলয়পুর—সেই ঘোষালবাড়ী—সব যেমন ছিল তেমনি আছে, শুধু ভবেশ নাই—রমেশ নাই—জয়ন্তী সুকুমার প্রভৃতি কেহ নাই। দুদিনের জন্য ভজহরি ভক্ত ভবেশচন্দ্রের পূত পদরজ-ধূসরিত পবিত্রপুরী অধিকার করিতে আসিয়াছিল, তাহার দণ্ড বিধাতা দিয়াছেন। আট বৎসরের পরিত্যক্ত ভিটা কিন্তু এখনও পেচক চামচিকার বাসস্থান হয় নাই। গৃহস্বামী না থাকিলেও গৃহের সৌষ্ঠব পূর্ব্বোপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। দোলমঞ্চে দোল হয়—পালপার্ব্বণে নহবৎ বাজে—প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি শুনা যায়—আরতির সময় ছেলের দল কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে আসে। স্বর্গ হইতে ভবেশ দেখিতেছেন, তাঁহার সাধের ভিটা পরম স্থান হইয়া উঠিয়াছে! যে গৃহে তিনি পূজাপাঠাদি করিতেন, তাহার স্থানে সুন্দর সুবৃহৎ শিবমন্দির শোভা পাইতেছে; যেখানে বসিয়া বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিতেন; সে স্থান নাটমন্দিরে পরিণত; যে গৃহে রমেশের পুত্র অনাহারে মরিয়াছিল, আজ সেখানে সদাব্রত—অতিথি অভ্যাগত পরম যত্নে পরিসেবিত হয়। ভবেশচন্দ্রের সোদরোপম বন্ধু হারাণ-চন্দ্রের যত্ন চেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে এবংবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

ধার্ম্মিক হারাণচন্দ্র দিবারাত্র সেই ঠাকুর-বাড়ীতেই থাকিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তথাকার সমস্ত কার্য্য করিতেন। গ্রামের লোকে সেই দেবালয়টীকে "ভবেশচন্দ্রের ঠাকুর বাড়ী" বলিত।

আজ রথযাত্রা। ঠাকুর বাড়ীতে মহোৎসব। বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে। অতিথিশালায় লোক আর ধরে না। হারাণচন্দ্রের কয়েকজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ভিন্নগ্রাম হইতে আসিয়া অদ্যকার যজ্ঞের রন্ধন ও পরিবেশনাদি করিতে ছেন। ব্রাহ্মণ অতিথিদিগের আহারকালে একজন পরিবেশনকারী দেখিলেন, এক ব্যক্তি একটী দশ বার বৎসরের ছেলে কোলে করিয়া এক কোণে বসিয়া আছে। তিনি অতিথিকে আহার করিতে আহ্বান করায় "কার বাড়ীতে কে খায়! হায় রে কপাল!" বলিয়াই অতিথি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। পরিবেশনকারী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"কর্ত্তা, কাকে কি বলছ? কোথায় আমি বলব 'তুমি খাও'—না ঠিক তার উল্টা শ্রী! আজ রথের দিন—জগন্নাথকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরে এসো দেখি!" এই বলিয়া সে ছেলের হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। প্রশ্নকারী ছুটিয়া গিয়া হারাণচন্দ্রকে বলিলেন—"অতিথিশালায় এক অদ্ভুত পাগল আসিয়াছে; সে অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতেছে।" হারাণচন্দ্র ছুটিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অদ্ভুত পাগলই বটে।

পাগল হারাণচন্দ্রকে দেখিয়াই হাসিয়া উঠিল, পরে বলিল—আপনি কি আমায় খাওয়াতে এসেছেন ?

হারাণচন্দ্র। নিশ্চয়, দয়া ক'রে ছেলেটাকে নিয়ে আহার করুন।

পাগল হাসিয়া কহিল—এ বাড়ীতে ঢের খেয়েছি, আর কত খাব! আপনার ছেলেকে আপনি খেয়েছি—আর কত খাব!

"রস ত—রস ত—তুমি আবার কথা কও"—বলিয়া হারাণচন্দ্র পাগলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি বলিলেন—তোমার নাম কি রমেশ ?

রমেশ। হ'তে পারে—তুমি দেখছি কিছু কিছু জান ?

হারাণ। জানি, জানি, রমেশ সব জানি! তোমার সঙ্গে এ কে ?

রমেশ। হতভাগ্যের ছেলে হতভাগ্য—তা' ছাড়া আর কি বলব ?

হারাণ। সুকুমার না ?

সুকুমার বলিয়া উঠিল—আজ্ঞা হাঁ।

হারাণচন্দ্র সুকুমারকে বুকে করিয়া রমেশকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। জয়ন্তীর সমাচার জিজ্ঞাসা করায় রমেশ কাঁদিতে লাগিল। হারাণচন্দ্র বুঝিলেন—হতভাগিনী ইহসংসারে নাই। তখন তিনি ভজহরির ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিবরণ বলিয়া শেষ

কহিলেন—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি রমেশ; এখন পিতা-পুত্র মিলিয়া তোমাদের ঠাকুরবাড়ীর সেবায়েত হও; সুকুমারকে মানুষ কর, আমি দেখিয়া চরিতার্থ হই! আমি আজ আট বৎসর ধরিয়া দুই বেলা শিবের কাছে মাথা খুঁড়িয়া বলি—"বাবা, আমাদের রমেশকে ফিরাইয়া দাও! বাবা আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন! আজ আমি ধন্য হইলাম।" হারাণচন্দ্রের চক্ষু জলভারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। হারাণচন্দ্রের পরিবারবর্গ আসিয়া সুকুমারকে কোলে করিলেন। সুকুমার আদর যত্ন পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইল। সুকুমারের হাসিমুখ দেখিয়া রমেশের আনন্দের অবধি রহিল না। হারাণচন্দ্র আহার করিবার জন্য রমেশকে অনেক অনুরোধ করিলেন। রমেশ কিন্তু আহার করিল না। পরিশ্রান্ত সুকুমার আহারান্তে নিদ্রিত হইলে রমেশ হারাণচন্দ্রকে বলিল—আপনি সুকুমারের অন্নদাতা পিতা হইয়া থাকুন, আমি এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলাম; স্ত্রী-হত্যাকারী নরাধমের দেব-সেবার অধিকার নাই।

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রমেশ প্রস্থান করিল।

———